বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাংলা মুখপত্র

বিশ্ব হিন্দু বার্তা

মূল্য : ১৫ টাকা

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্
ওঁ
ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

৫১তম বর্ষ ◆ সপ্তম সংখ্যা ◆ ফাল্গুন, ১৪৩২ [ফেব্রুয়ারি, ২০২৬]

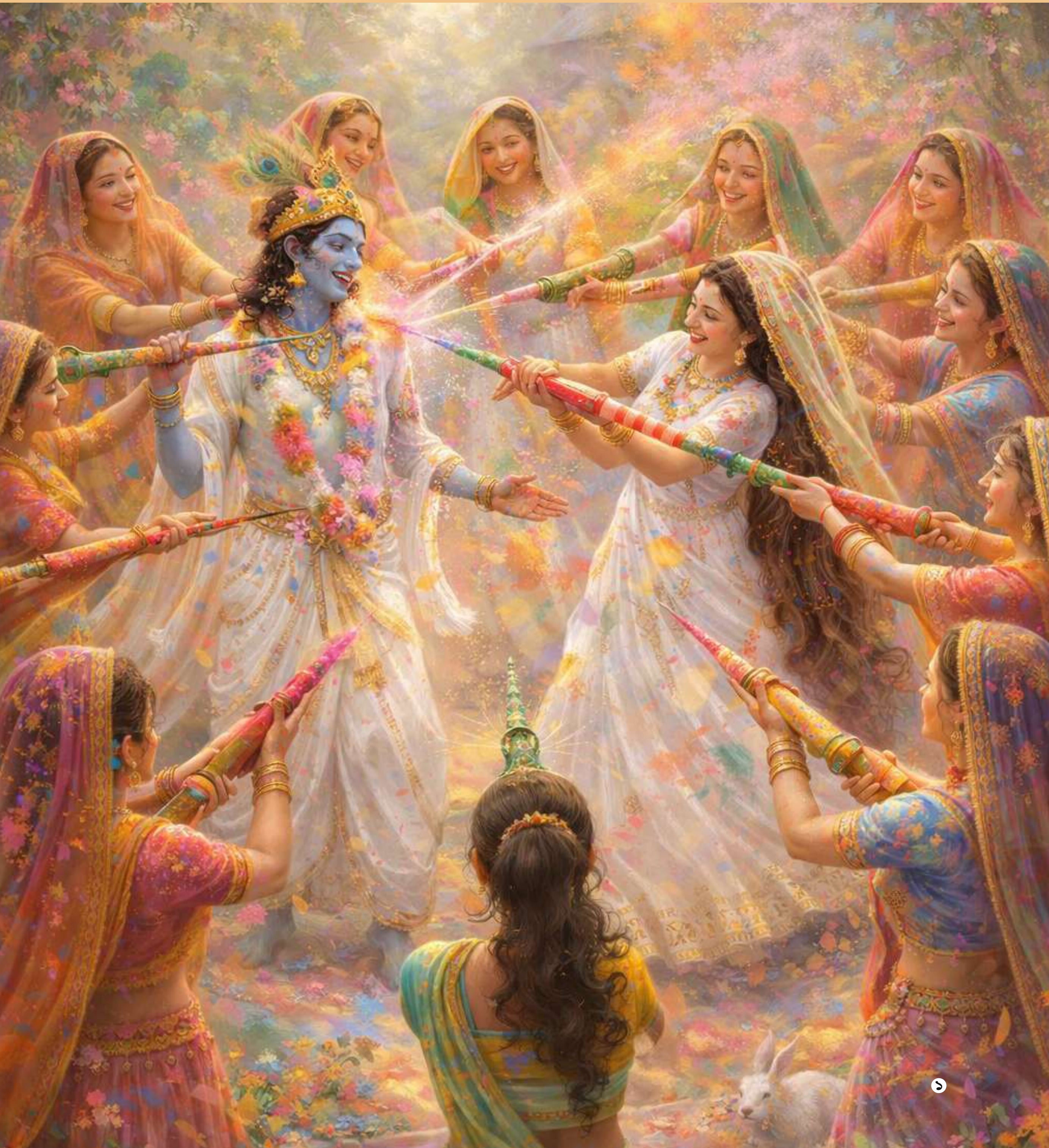

২০২৬ আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় 'বিশ্ব হিন্দু বার্তা'-র স্টল

কল্যাণ বাণী

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্‌।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে।। ১৮/২৩।।

'অনাসক্ত, রাগ দ্বেষ বর্জিত ফলাভিলাষশূন্য ব্যক্তির দ্বারা যে নিত্যকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাকে সাত্ত্বিক (কর্ম) বলা হয়।'

সম্পাদকীয়...

দোল পূর্ণিমা (দোলযাত্রা) ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পালিত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান উৎসব। যা বসন্ত, প্রেম ও রঙের উৎসব হিসেবে পরিচিত। এই দিনে রাধা-কৃষ্ণের মূর্তিকে দোলনায় চড়িয়ে আবির ও রঙ মাখিয়ে পূজা করা হয়। এটি মূলত বসন্তের আগমন এবং রাধা-কৃষ্ণের শাশ্বত প্রেমকে উদযাপনের দিন। বৈষ্ণব বিশ্বাস অনুযায়ী, এই দিনে শ্রীকৃষ্ণ আবির ও গুলাল নিয়ে রাধিকা ও সখীদের সাথে রং খেলায় মেতেছিলেন। নবদ্বীপসহ সমগ্র বাংলায় এই একই তিথিতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মতিথি হিসেবেও পালিত হয়, তাই একে গৌর-পূর্ণিমাও বলা হয়। ২০২৬-এ দোল পূর্ণিমা বা দোলযাত্রা আগামী ৩ মার্চ ২০২৬ (মঙ্গলবার) পালিত হবে। বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে দিনটি ১৯ ফাল্গুন ১৪৩২। হোলিকা দহন বা ন্যাড়া পোড়া ৩ মার্চ সন্ধ্যায়। দোল উৎসবের প্রকৃত রং খেলা ৪ মার্চ (বুধবার) পালিত হবে। দোলযাত্রা উপলক্ষে 'বিশ্ব হিন্দু বার্তা'র এই সংখ্যার প্রচ্ছদ ভাবনা রাখা হয়েছে।

যাঁদের রক্তে পাকিস্তান আছে, যাঁরা স্বাধীনতার বিরোধী ছিল, এমনকি শত্রুদেশ পাকিস্তানের সেনার সঙ্গ দিয়েছিল, এমনই চরমপন্থী জামাত-এ-ইসলামী পার্টির (বাংলাদেশের) সমর্থনে মোহাম্মদ ইউনুস ক্ষমতা দখল করে, সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিধনে জেহাদে লিপ্ত। শুধু তাই নয় ভারতবর্ষ বিরোধী কাজেও লিপ্ত এই ব্যক্তি। যে ভারতবর্ষ নিজেদের সেনাবাহিনীকে পাঠিয়ে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন বর্তমান বাংলাদেশ নামক দেশকে। চরমপন্থী জামাত-এ- ইসলামীর জন্ম হয় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে লাহোর শহরে সৈয়দ আবুল আলা মৌদুদী দ্বারা। আজ ৮৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, আধুনিকতার জোয়ার এসেছে, কিন্তু জামাতের চরমপন্থী মানসিকতার কোন পরিবর্তন আসেনি, উপরন্ত বেড়েই চলেছে। এই চরমপন্থীদের খুশি করার জন্য কার্যকরী ইউনুস সরকার সম্প্রতি চিটাগ্রামের মিরসরাইতে ভারতবর্ষকে চুক্তি দ্বারা আবন্টিত ৮৫০ একর জমি চীনকে ড্রোন নির্মাণ করার জন্য দিয়ে দিয়েছে। যা ভারতবর্ষের জন্য একটি চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে দক্ষিণ-এশিয়াতে ভারত, পাকিস্তানের পর বাংলাদেশ তৃতীয় ড্রোন নির্মাণকারী দেশ হয়ে যাবে। এই মিরসরাইটি ভারতের সীমানা থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এছাড়া বাংলাদেশ, চীন থেকে কিস্তিতে ২০টি (J-10)CE ফাইটার জেট এবং বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার কেনার চুক্তি করেছে। চীন চেকবুক ডিপ্লোমেসি পথে এগিয়ে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে ঘিরবার পরিকল্পনা করেছে। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সৈন্যতন্ত্রে চীনের এতটাই গহনে প্রবেশ যে, স্ট্রিংগ অফ পার্লস-এর (ঝিনুকের মধ্যে মুক্ত) মতো ভারতবর্ষকে চিন্তিত করে তুলেছে। এই ঘটনাকে সামান্য বলে ভাবা উচিত হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারকে ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তার সময় এসেছে। বাংলাদেশের সীমান্তকে আরো বেশি সুরক্ষিত করে তোলা দরকার। তাই আগামী নির্বাচনে জনসাধারণকে মত দানের আগে চিন্তা করে ভোট দান করা উচিত।

মহারাষ্ট্রের স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে এ.আই মিম (AI MIM) এবং ইসলাম (Islam) নামক দুটি রাজনৈতিক দল যে ধরনের সাফল্য অর্জন করেছে, তা কিন্তু মুসলিম রাজনীতির জন্য এক বড় ধরনের পরিবর্তনের ছবি দেখাচ্ছে। এই মুসলিম ভোট প্রাদেশিক রাজনৈতিক দল, কিংবা কংগ্রেসের পক্ষেই আগে যেত। ভারতীয় জনতা পার্টিকে রুখবার জন্য মুসলিমরা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোকেই ভোট দিত। বিহারের এবং মহারাষ্ট্রে নির্বাচনে মুসলিম সংখ্যাবহুল এলাকাতে এ.আই মিমের পক্ষে এবং ইসলাম পার্টির পক্ষে ভোট দিতে দেখা গেছে, বিশেষভাবে মুসলিম যুবকদের। অর্থাৎ মুসলিমদের মধ্যে ভোটের একমুখীনতা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু অন্যদিকে হিন্দুদের মধ্যে হচ্ছে না, তা ভাবা দরকার।

কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ সংকল্প নিয়েছেন ২০২৬ এর মার্চ মাসের মধ্যে নকশালবাদের সমস্যা থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করবেন এবং সেই দিশাতে কঠোরভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আবার অমিত শাহ আরও একটি সংকল্প নিয়েছেন, ২০২৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাদক পদার্থ তস্করদের নেটওয়ার্ককে ধ্বংস করবেন। এই মাদক পদার্থের ব্যবসা সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ জুড়ে চলেছে। সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে গত ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ২৫,৩০০ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য আটক করা হয়েছে। পাঞ্জাব, মণিপুর এবং

উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলো এবং গুজরাটের পথে এই তস্করি ব্যবসা চলে। ল্যাটিন আমেরিকাতে যে হিরোইন ১ হাজার ডলারে বিক্রি হয়, তাই ইউরোপে ১ লক্ষ ২৫ হাজার ডলারের অধিকে বিক্রি হয়। অর্থাৎ বিরাট আর্থিক লাভ হয় এই তস্করিতে। ফলে এই তস্কররা আর্থিকভাবে অত্যন্ত বলশালী। এই অর্থ দ্বারা বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে ভারতবর্ষে এই নেটওয়ার্ক অত্যন্ত প্রভাবশালী। এই অনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক হস্তক্ষেপকে বন্ধ করা দরকার। এই কারণে কেন্দ্রীয় সরকার নারকোটিস কন্ট্রোল ব্যুরোকে (NCB) শক্তিশালী করতে চলেছে এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করবে বলে স্থির করেছে। সাধারণ মানুষকেও এই কাজে সরকারকে সমর্থন দিয়ে মাদকমুক্ত সমাজ গড়া উচিত।

আমরা জানি পাঞ্জাবের রাজধানী শহর হচ্ছে চন্ডিগড়, এবং সেখানেই বিধানসভার ভবন আছে। কিন্তু গত ২৫শে নভেম্বর শ্রীআনন্দপুর সাহিবে এক বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়। সেখানে ঘোষণা করা হয়—

১) শ্রীঅমৃতসর সাহিব, ২) তখ্ত দমদমা সাহিব এবং ৩) তখ্ত কেশরগড় সাহিব, এই তিনটি পবিত্র শহরে তামাক জাতীয় দ্রব্য, মদ, মাংস ইত্যাদি বিক্রয় বন্ধ করা হবে। এছাড়া তীর্থক্ষেত্রে পর্যটন এবং সুরক্ষা হেতু বিশেষ বাজেট বরাদ্দ করা হবে। প্রথম নজরে এটি হয়তো কেবলমাত্র সরকারি ঘোষণা মাত্র বলে মনে হবে, কিন্তু এর পিছনে একটি বড় ও গভীর অর্থ এবং প্রভাব আছে। বাস্তবে পাঞ্জাবে যুবক-যুবতীরা নেশার গর্তে ডুবে আছে। এই নেশার বিষয় নিয়ে সিনেমা পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে। এক সময় পাঞ্জাবে আতঙ্কবাদ গ্রস্ত প্রদেশ ছিল, বর্তমানে নেশার সমস্যাগ্রস্ত প্রদেশে হয়েছে। এই দুই বিষয়ের পেছনে পাকিস্তানিদের হাত ছিল বা আছে একথা অস্বীকার করা যাবে না। এই নেশার আসক্তির ফলে পাঞ্জাব যুবসমাজ পঙ্গু হয়ে গেছে এবং বহু পরিবারও ধ্বংস হয়ে গেছে। এইরকম পরিস্থিতিতে পাঞ্জাব সরকার যে তিনটি পবিত্র শহর নেশা মুক্ত বলে ঘোষণা করেছে, তা প্রাথমিক পদক্ষেপ বলে ভাবা উচিত। এই পদক্ষেপ অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য।

সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার, জোহান্সবার্গ শহরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পৃথিবীতে সুস্থ পরিবর্তন আনার জন্য চারটি মন্ত্র প্রদান করেছেন। আলোচকরা হয়ত এইগুলোকে ভাষণবাজি বলে খারিজ করার প্রয়াস করবে, কিন্তু যে যোজনা বা মন্ত্রগুলির কথা মোদিজি বলেছেন, তা সঠিকভাবে কার্যকর করা যায় তাহলে অবশ্যই ফলপ্রসু হবে।

প্রথমত : পূর্বজদের জ্ঞানগুলোকে ডিজিটাল ব্যাংক রূপে পরিবর্তিত করা। ফলে সম্পূর্ণ পৃথিবীতে পারম্পরিক জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক জ্ঞানের ভাণ্ডার সকলের জন্য উপলব্ধ হবে।

দ্বিতীয়ত : যুবকদের কৌশল যুক্ত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা। স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং এর উপর দৃষ্টি দেওয়া। এর ফলে প্রশিক্ষিত শ্রমবল নির্মাণ হবে, যার ফলে স্থানীয় দক্ষতা ও ক্ষমতার বিকাশ হবে। যা যে কোন দেশের বিকাশের সহায়ক হবে।

তৃতীয়ত : মহামারীর ফলে উৎপন্ন স্বাস্থ্য সংকট এবং ভূমিকম্প, সুনামির মত প্রাকৃতিক বিপদগুলোর মোকাবিলা করার জন্য সামগ্রিক দায়িত্ব নির্মাণ করা সম্ভব হবে। মোদিজি বলেছেন, জি-টোয়েন্টি দেশগুলিতে গ্লোবাল হেলথ কেয়ার রেসপন্স টিম তৈরি করা উচিত। এই ধরনের কাজের জন্য দেশের সীমারেখার ঊর্ধ্বে উঠে সবারই সাহায্যের হাত বাড়ানো উচিত।

চতুর্থত : নেশা মুক্ত ও আতঙ্কবাদ মুক্ত পৃথিবী নির্মাণের পথে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। মাদক পদার্থের তস্করির ফলে জনস্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা, বৈশ্বিক সুরক্ষার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। এই মাদক দ্রব্যের অর্থ দ্বারাই আতঙ্কবাদীরা পোষিত হয়। তাই এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত প্রণালীগুলোর মধ্যে পৃথিবী জুড়ে সমন্বয় গড়া দরকার। মাদক পদার্থ দ্বারা অর্জিত ধন-সম্পদকে আটক করলেই, আপনা-আপনি আতঙ্কবাদীদের ফান্ডিং বন্ধ হয়ে যাবে। যুব সমাজ নেশামুক্ত হলে এবং আতঙ্কবাদকে রুখতে পারলে সমগ্র পৃথিবীর দেশগুলো তার সমস্ত মনোযোগ মানব কল্যাণ এবং দেশের বিকাশে নিবেশ করতে পারবে।

জি-টোয়েন্টির মতো বৈশ্বিক মঞ্চে ভারতের এই সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হলে ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা বাড়বে এবং ভারতবর্ষ বিশ্বগুরু হওয়ার পথে অগ্রসর হবে। ■

আগামী দুই সংখ্যার বিষয়

চৈত্র ১৪৩২ (মার্চ, ২০২৬) : চৈত্র প্রতিপদ, রামনবমী, মহাবীর জয়ন্তী, হনুমান জয়ন্তী, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, চৈতন্য মহাপ্রভু বিবিধ।

বৈশাখ ১৪৩৩ (এপ্রিল, ২০২৬) : চড়ক পূজা, আম্বেদকর জয়ন্তী, বাংলা নববর্ষ, অক্ষয় তৃতীয়া, পরশুরাম জয়ন্তী, বুদ্ধ পূর্ণিমা, ছত্রপতি শিবাজী জয়ন্তী, সীতা নবমী, নৃসিংহ অবতার বিবিধ।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ
ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের
বাংলা মুখপত্র

বিশ্ব হিন্দু বার্তা

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্ ওঁ ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

কার্যালয় : ৩৩, ভূপেন বোস এভিনিউ, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪

প্রচার কার্যালয় : ১৭বি, নলিন সরকার স্ট্রিট, খান্না মোড়, কলকাতা-৬

দূরভাষ : ২৫৫৫-৩৫৮৯, দিলীপকুমার ঝাঁওর : ৯৯৩৩১৫০০৩৭

pnb
SCAN & PAY USING ANY BHIM UPI APP
9038149815m@pnb
MERCHANT: VISHVA HINDU VARTA

৫১তম বর্ষ ❋ সপ্তম সংখ্যা ❋ ফাল্গুন, ১৪৩২ (ফেব্রুয়ারি, ২০২৬)

'বিশ্ব হিন্দু বার্তা'র পরিচালন মণ্ডলী

● সভাপতি
শ্রীদিলীপকুমার ঝাঁওর
● সহ-সভাপতি
শ্রীচন্দ্রনাথ দাস (সম্পাদক, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীতরুণকুমার লায়েক (সম্পাদক, মধ্যবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীলক্ষ্মণ বনসল (সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীশঙ্কর রায় (সম্পাদক, ত্রিপুরা প্রান্ত)

● সম্পাদক
অধ্যাপক ড. জয়ন্ত বিশ্বাস
● সহ-সম্পাদক
শ্রীসৌগত বসু, সুশ্রী পারমিতা পাল
● প্রচার প্রসার প্রমুখ
শ্রীজয়ন্ত ভৌমিক

● সহ-প্রচার প্রসার প্রমুখ
শ্রীচন্দন গুপ্তা (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীবিপ্লব চ্যাটার্জি (মধ্যবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীশ্রীকান্ত ঘোষ (উত্তরবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীঅমলকান্তি দাশ (ত্রিপুরা প্রান্ত)
● সদস্য : শ্রীপীতারুণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীপক চৌধুরী, শ্রীঅর্ণব দে, শ্রীশুভজিৎ দাস

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৩
চার ধাম—অমলকান্তি দাশ ৬
আনন্দ, উল্লাস ও সংস্কৃতির সঙ্গম-দোল—আদিত্য দেব ৮
বসন্ত পঞ্চমী—দেবী সরস্বতীর পূজন ও মদনোৎসব —ড. জয়ন্ত বিশ্বাস ১০
চৈতন্যলীলায় দোল মহোৎসব—রবিব্রত ঘোষ ১২
শিব উপাসনার পর্ব—শিবরাত্রি —রাজকুমারী মাহেশ্বরী ১৫
গীতোক্ত জন্মান্তরবাদ ও পুনর্জন্ম—প্রোজ্জ্বল মণ্ডল ১৮
সমগ্র ক্রান্তির অগ্রদূত : স্বামী দয়ানন্দ—পারমিতা পাল ২০
সন্ত রবিদাস জয়ন্তী : মাঘ পূর্ণিমা —বিনায়ক দেশপাণ্ডে ২২
হিন্দু জীবনে মন্দির-মঠ ও অর্চক পুরোহিতের ভূমিকা —দিলীপ কুমার ঝাঁওর ২৪
বাংলার হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দুধর্মের বৈশ্বিক প্রাসঙ্গিকতা : এক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণ —বরিষণ চট্টোপাধ্যায় ২৭
বন্দেমাতরম্ সংগীত—অধ্যাপক বিশ্বেশ্বর বেরা ২৮
রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদ —সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ৩০
বাবরি ধাঁচা ভাঙার প্রেক্ষাপটে : বাংলাদেশের হালচাল, ১৯৯২—ওমপ্রকাশ ঘোষ রায় ৩৬
धर्म के 30 लक्षण—অরুণ চুড়ীবাল ৪১

প্রতি সংখ্যার মূল্য	বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	দীর্ঘমেয়াদী গ্রাহক (১৫ বছর)	ডাক মাশুল
১৫ টাকা	১৮০ টাকা	২৫০০ টাকা	নিঃশুল্ক

বিশেষ ডাক ব্যবস্থায় 'বিশ্ব হিন্দু বার্তা'র গ্রাহক শুল্ক বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বিশ্ব হিন্দু বার্তার গ্রাহক হওয়ার জন্য নিচের দেওয়া ব্যাঙ্ক তথ্যে শুল্ক পাঠান এবং নিজের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর এই নম্বরে জানান : জয়ন্ত ভৌমিক : ৮৯৬১৭১২১০৬

VISHVA HINDU VARTA
Punjab National Bank A/c. No. : 1183010102690
IFSC Code : PUNB0118320, MICR : 700024325
Shyambazar Market Evening Branch

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি (বিশেষ সংখ্যা)

Back Cover Page	Rs. 50,000/-
Inside Front or Back Cover Page	Rs. 30,000/-
Inside Full Colour Page	Rs. 20,000/-
Colour Half Page	Rs. 10,000/-
Colour Quater Page	Rs. 5,000/-

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
E-mail : advertisement.vishvahinduvarta@gmail.com

প্রকাশন বিভাগ : বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ
মুদ্রণ : আদিত্য গ্রাফিক্স অ্যান্ড প্রিন্টিং
RNI No. : 30136/1976

● লেখকদের প্রতি

১। প্রতি ইংরেজি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে লেখা পাঠান।
২। পরিষদ সম্পর্কে বার্তা ছবি ও প্রতিবেদন e-mail কিংবা WhatsApp-এর মাধ্যমে পাঠাতে পারেন।
৩। প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখিত তথ্যের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে লেখক বা প্রাবন্ধিকের, কর্তৃপক্ষের নয়।

চার ধাম

অমলকান্তি দাশ (ত্রিপুরা)

ওম কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ, মাধবায় নমঃ, গোবিন্দায় নমঃ, বৈষ্ণবে নমঃ, মধুসূদনায় নমঃ, ত্রিবিক্রমায় নমঃ, বামনায় নমঃ, শ্রীধরায় নমঃ, ঋষীকেশায় নমঃ, পদ্মনাভায় নমঃ, দামোদরায় নমঃ

চার ধাম বলতে ভারতের চারটি প্রধান হিন্দু তীর্থস্থান কে বুঝানো হয় যা ভগবান বিষ্ণুকে সমর্পিত। মূল চার ধাম এবং ছোট চার ধাম নামক আবার দুটি ভাগ আছে। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে এই তীর্থগুলির যাত্রা মোক্ষ লাভের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পুরাণে উল্লেখিত আছে যে হরি (বিষ্ণু) এবং হর (শিব) চিরন্তন বন্ধু। কথিত আছে যেখানে ভগবান বিষ্ণুর বাস সেখানে ভগবান শিবেরও বাস অর্থাৎ ভগবান শিব ও ভগবান বিষ্ণু সর্বদা একই স্থানে বসবাস করেন। তাই কেদারনাথকে বদ্রীনাথের জুটি, রাম সেতুকে রামেশ্বরমের জুটি, সোমনাথকে দ্বারকার জুটি ও লিঙ্গরাজকে জগন্নাথ পুরীর জুটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

চার ধামের মধ্যে মূল চারধামগুলি যথাক্রমে— জগন্নাথ পুরী (উড়িষ্যা), রামেশ্বরম (তামিলনাড়ু), দ্বারকা (গুজরাট), বদ্রীনাথ (উত্তরাখণ্ড)।

১) শ্রীজগন্নাথপুরী ধাম

জগন্নাথ মন্দির ভারতবর্ষের উড়িষ্যা রাজ্যের পুরী নামক শহরে ভুবনেশ্বর থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। জগন্নাথ মন্দিরে ভগবান কৃষ্ণ (জগন্নাথ রূপে) ভাই বলরাম ও বোন সুভদ্রার সাথে পূজিত হন।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ভগবান বিষ্ণুর স্বপ্নাদেশে রাজা ইন্দ্রধ্যুম্ন ভগবান বিষ্ণুর নীল মাধব রূপকে প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছায় বিশ্বকর্মা দেবকে বিগ্রহ তৈরির আগ্রহ করলে তিনি শর্ত রাখেন যে ২১ দিন পর্যন্ত মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকবে এবং তিনি একান্তে মন্দিরের ভিতরে মূর্তি তৈরি করবেন। কিন্তু ১৫ দিন পরে রাজা মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়ায় বিশ্বকর্মা দেব সেখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে যান এবং ভগবান জগন্নাথ বলরাম এবং সুভদ্রা এই বিগ্রহগুলি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

নিম গাছের কাঠ দিয়ে ভগবান জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর বিগ্রহ তৈরি হয় যা প্রত্যেক ১২ বছর পর পর পুরনো বিগ্রহের স্থানে নতুন বিগ্রহ স্থাপিত হয় একে 'নবকলেবর' বলা হয়। মান্যতা আছে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় থাকে এই জগন্নাথদেবের বিগ্রহে।

প্রত্যেক বছর আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ভগবান জগন্নাথদেব ভাই বলরাম ও বোন সুভদ্রাকে সাথে নিয়ে গুন্ডিচা মন্দিরে রথে চড়ে যান। যা রথযাত্রা নামে বিখ্যাত। জগন্নাথ মন্দিরের কিছু অলৌকিক ঘটনা যেমন—মন্দিরের চূড়ায় স্থিত পতাকা সবসময়ই বাতাসের উল্টোদিকে উড়তে থাকে, মন্দিরের উপর দিয়ে কোন পাখি কখন উড়ে না, মন্দিরের মূল চূড়ার ছায়া কখন মাটিতে পড়ে না।

২) শ্রীরামেশ্বরম ধাম

আদি গুরু শঙ্করাচার্য্য দ্বারা স্থাপিত হিন্দুদের চার ধামের মধ্যে অন্যতম একটি ধাম হল রামেশ্বরম। চার ধামের প্রত্যেক ধামই কোন না কোন যুগের সাথে সম্পর্কিত।

শ্রীজগন্নাথ ধাম

শ্রীরামেশ্বরম ধাম

শ্রীদ্বারকা ধাম

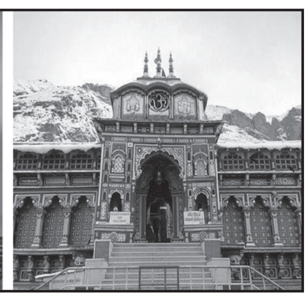
শ্রীবদ্রীনাথ ধাম

রামেশ্বরম ত্রেতাযুগের প্রতিনিধিত্ব করে। ভগবান শ্রীরাম ও মাতা সীতার দ্বারা রামেশ্বরমে ভগবান শিবের লিঙ্গ রূপ স্থাপন করা হয়েছিল। আদি গুরু শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষের চারদিকে চার ধামের স্থাপনা করেন পূর্বে জগন্নাথ পুরী, পশ্চিমে দ্বারকা, উত্তরে বদ্রীনাথ, এবং দক্ষিণে রামেশ্বরম। রামেশ্বরম ভারতবর্ষের তামিলনাড়ু রাজ্যের রামনাথপুরম জেলায় স্থিত পাম্বন দ্বীপে অবস্থিত।

৩) শ্রীদ্বারকা ধাম

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরা থেকে চলে আসার পর গোমতী নদী এবং আরব সাগরের তীরে একটি দিব্য নগরীর নির্মাণ করান। কথিত আছে স্বয়ং বিশ্বকর্মা দেব এই নগরীর নির্মাণ করেছিলেন। একেই দারকা নগরী বলা হয়ে থাকে যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ের দোয়ার বা স্বর্গের দ্বার নামেও পরিচিত।

পৌরাণিক কথানুসারে মহাভারতের যুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিজ ধামে গমনের পরে মাতা গান্ধারীর অভিশাপের ফল স্বরূপ যদু বংশীয়দের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ চূড়ান্ত আকার ধারণ করে এবং সম্পূর্ণ দ্বারকা নগরী সমুদ্রেতে ডুবে যায়।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ সমুদ্রের নীচে দ্বারকা নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করতে পেরেছেন যা সেই পৌরাণিক কথাগুলিকে সত্য বলে প্রমাণ করছে।

ভারতবর্ষের গুজরাট রাজ্যের দেবভূমি দ্বারকা জেলায় অবস্থিত এই পবিত্র দ্বারকাধাম।

৪) শ্রীবদ্রীনাথ ধাম

পৌরাণিক কথা অনুসারে একদা ভগবান বিষ্ণু হিমালয়ে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন তখন মাতা লক্ষ্মী দেবী ভগবান বিষ্ণুকে সেখানকার প্রতিকূল পরিবেশ থেকে রক্ষা করতে নিজে বদ্রি (কুল) গাছের রূপ ধারণ করে ভগবান বিষ্ণুকে সেই প্রতিকূল পরিবেশের হাত থেকে রক্ষা করেন। তাই ভগবান বিষ্ণু খুশি হয়ে সেই স্থানের নাম বদ্রীনাথ রাখেন। এখানে ভগবান বিষ্ণু এবং মাতা লক্ষ্মীদেবী একসাথে বাস করেন বলে মান্যতা আছে।

বদ্রীনাথ মন্দিরটি ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হলে জয়পুরের রাজা মন্দিরের পুনরুদ্ধার করেন।

চার ধামের মধ্যে এই বদ্রীনাথ ধামটি হল একমাত্র ধাম যা বছরের ৬ মাস প্রতিকূল পরিবেশের জন্য মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে ছয় মাসের জন্য মন্দির বন্ধ হওয়ার পূর্বে যে প্রদীপ জ্বালিয়ে মন্দিরের দরজা বন্ধ করা হয় ৬ মাস পর মন্দিরের দরজা খোলার পর দেখা যায় সেই প্রদীপ জ্বলছে। মান্যতা আছে বন্ধ থাকা এই ছয় মাস দেবঋষী নারদ মুনি এবং অন্যান্য দেবতাগণ তখন বদ্রীনাথের পূজার্চনা করেন।

প্রত্যেক বৎসর এপ্রিল মাসের শেষ বা মে মাসে (তিথি অনুসারে) মন্দিরের দরজা খুলে এবং নভেম্বরের মধ্য অথবা শেষ সপ্তাহে (ভাই ফোঁটার আশেপাশের সময়) মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

অধিক পরিমাণ বরফ পড়ার কারণে বদ্রীনাথ মন্দির বৎসরের প্রায় ৬ মাস খোলা থাকে (গ্রীষ্মকালীন) এবং প্রায় ৬ মাস বন্ধ থাকে (শীতকালীন)।

শীতকালে মন্দির বন্ধ থাকা কালীন জোশী মঠের নরসিংহ মন্দিরে ভক্তগণ বদ্রীবিশালের পূজার্চনা করেন। এই বদ্রীনাথ মন্দিরটি ভারতবর্ষের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের চামোলী জেলায় পবিত্র অলকনন্দা নদীর তীরে অবস্থিত। এই মন্দির নর ও নারায়ন পর্বতমালা দ্বারা আবৃত।

হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে মূল চারধাম ছাড়াও ছোট চারধাম নামে আরো চারটি স্থান হিমালয়ের কোলে অবস্থিত সেগুলি হল—যমুনেত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ এবং বদ্রীনাথ।

প্রচলিত রীতি অনুসারে এই চারটি স্থানের যাত্রা পদ্ধতি পশ্চিম থেকে শুরু করে পূর্বে অর্থাৎ প্রথমে যমুনেত্রী—যা মা যমুনা নদীকে সমর্পিত। উত্তর কাশি জেলায় মা যমুনা নদীর উৎপত্তি স্থল।

মান্যতা আছে যদি কেউ যম দ্বিতীয়া অর্থাৎ ভাই ফোঁটার দিন যমুনা নদীতে স্নান করেন তবে যম লোকের ভয় থেকে তিনি মুক্তি পেয়ে যান।

দ্বিতীয় গঙ্গোত্রী—যা মা গঙ্গাকে সমর্পিত। উত্তরকাশী জেলায় পবিত্র মা গঙ্গা নদীরও উৎপত্তি স্থল।

তৃতীয় কেদারনাথ—ভগবান শিব কে সমর্পিত এই তীর্থস্থান। রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় স্থিত দেবাদিদেব মহাদেবের এই জ্যোতির্লিঙ্গের মন্দির।

চতুর্থ বদ্রীনাথ : ভগবান বিষ্ণুকে সমর্পিত। এই মন্দির চামোলী জেলার পবিত্র অলকনন্দা নদীর তীরে অবস্থিত।

এই ক্রম অনুসারেই এই তীর্থস্থানগুলি যাত্রা করার প্রচলিত রীতি চলে আসছে।

ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। ■

আনন্দ, উল্লাস ও সংস্কৃতির সঙ্গম-দোল

আদিত্য দেব

প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে হোলি বা দোল উৎসব পালন করা হয়। এই উৎসব দেশের অনেক জায়গাতেই বসন্ত উৎসব নামে পরিচিত। হিন্দি ভাষীদের ক্ষেত্রে হোলির আগের দিনটিকে ছোটি হোলিও বলা হয়। বাস্তবে এই দিনে শীতকে বিদায় দেওয়া হয় এবং গ্রীষ্মকে স্বাগত জানানো হয়। ধার্মিক, পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক তথ্য থেকে হোলি সম্পর্কে অনেক কথা বা গল্প পাওয়া যায়, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—অসুর রাজ হিরণ্যকশিপু তাঁর বিষ্ণুভক্ত পুত্র প্রহ্লাদকে মারার জন্য অনেক প্রয়াস করেন, কিন্তু সফল না হলে তাঁর বোন হোলিকার সাহায্য নিয়েছিলেন। অসুর রাজের বোন হোলিকার আগুন প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ছিল, তাই রাজার আদেশে হোলিকা ভক্ত প্রহ্লাদকে নিয়ে আগুনে বসেছিলেন। কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর কৃপাতে ভক্ত প্রহ্লাদ প্রাণে বেঁচে যান এবং হোলিকা সেই আগুনে পুড়ে মারা যায়। এইভাবে হোলিকার দহন অন্যায়ের উপর ন্যায়ের বিজয় উৎসবে পরিণত হয়। রং খেলার মাধ্যমে এইআনন্দ উৎসব পালন করে সমস্ত মানুষ।

অন্য এক পৌরাণিক কথা অনুসারে মাতা পার্বতীর সাহায্য করার জন্য কামদেব তপস্যারত ভগবান শঙ্করের মনে কাম জাগ্রত করতে প্রেমবান চালান। এর ফলে শিবের তপস্যা ভঙ্গ হয়ে যায় এবং ক্রোধিত শিব কামদেবকে ভস্ম করে দেন। তখন কামদেবের পত্নী রতী বিলাপ করলে মাতা পার্বতী শিব ঠাকুরকে কামদেবকে জীবিত করার জন্য অনুরোধ করলেন। এই ঘটনাটি ফাল্গুন মাসে ঘটিত হয়েছিল বলে, এই দিনটিকে প্রেমের পর্ব রূপে পালন করা হয়।

অন্য আরেক ঘটনা অনুসারে, অযোধ্যায় ভগবান শিবের বরদান প্রাপ্ত ধুন্ধী নামক এক রাক্ষসি ছিল, যাকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মারা যাবে না। এই রাক্ষসির হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য নগরবাসীরা বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে প্রচণ্ড হইচই শুরু করে রঙ খেলা শুরু করে। এই হইচই এবং রঙ খেলার প্রভাবে ধুন্ধী রাক্ষসি বিরক্ত হয়ে অযোধ্যা থেকে পালিয়ে যায়। তখন থেকে রঙ খেলাকে ধুন্ধী বলা শুরু করা হয়।

বৈষ্ণবদের মতে দোল পূর্ণিমার দিন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা এবং অন্যান্য গোপিনীদের সঙ্গে রঙ খেলায় মত্ত হয়েছিলেন, সেখান থেকেই দোলযাত্রা শুরু হয়। বাংলাতে ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মগ্রহণকে কেন্দ্র করে এই মহোৎসবটি পালন করা শুরু হয়। সেই কারণে এই তিথিকে গৌর পূর্ণিমা বলা হয়ে থাকে। এছাড়া হিন্দু পুরাণে প্রায় ২০০০ বছর আগে ইন্দ্রদ্যুম্নের দ্বারা গোকুলে হোলি খেলা প্রচলনের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার বসন্ত পূর্ণিমার দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেশী নামক অসুরকে বধ করেছিলেন, যে খুবই অত্যাচারী ছিল। অন্যায় শক্তির ধ্বংস হওয়ার জন্য আনন্দ উৎসব রূপে এই দিনটি উদযাপিত হয়। নারদপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ এবং জৈমিনি মীমাংসায় রঙের উৎসবের বিবরণ পাওয়া যায়। ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের এক শিলা লিপিতে রাজা হর্ষবর্ধন কর্তৃক হোলিকা উৎসব পালনের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাস্তবে সমাজের অশুভ শক্তির বিপরীতে শুভশক্তির বিস্তার বা জয়লাভ এবং সকলের সঙ্গে সকলের আনন্দ-পূর্বক সম্পর্ক স্থাপন এই উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য।

সম্পূর্ণ দেশ জুড়ে এই উৎসব নানাভাবে পালিত হয়। বিশেষ করে মথুরা বৃন্দাবনে হোলি অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয়। দেশ-বিদেশের অনেক মানুষ এখানে হোলি উৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এই অনুষ্ঠান ৯ দিন ধরে পালিত হয়। শ্রীরাধার জন্মস্থান বরসানাতে লাঠমার হোলি খেলার মাধ্যমে এই উৎসব পালিত হয়। এই খেলায় মহিলারা পুরুষদের লাঠি মারেন। পাঞ্জাবে হোলি উৎসব তিনদিন ধরে পালিত হয়, একে হোল্লা মহল্লা বলা হয়, তবে হোলি উৎসব হয়ে যাওয়ার ঠিক একদিন পরেই এই উৎসব পালিত হয় গুরু গোবিন্দ সিং-এর স্মরণে। মণিপুরের আয়োসাঙ্গ হোলির পর থাবালচোঙবা নৃত্য উৎসব পালন করা হয়। মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র হোলিকে রঙপঞ্চমী রূপে পালন করা হয়। অন্ধ্রপ্রদেশে হোলি, মেদুরি হোলি রূপে পালিত হয়ে থাকে এবং ভগবান কৃষ্ণের ভক্তি ভজন গায়ন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে হোলিকে দোলযাত্রা রূপে বলা হয়ে থাকে। কেরালা, কোঙ্কনি এবং কুডুম্বী সম্প্রদায়ের মানুষ মন্দিরে গিয়ে লোকগীতি গায়ন করে ও মিষ্টান্ন খেয়ে রঙের উৎসব পালন করে থাকেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে দোল এবং রাধাকৃষ্ণের

দোল লীলার তাৎপর্য এসেছে। দোলযাত্রা উৎসব শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব নামে পরিচিত। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও গানে হোলি বারবার উঠে এসেছে। দোল বা হোলি দুটোই রঙের খেলা হলেও, এই দুটি ভিন্ন অনুষ্ঠান। দোল আগে উদযাপিত হয়ে থাকে এবং তারপর হোলি পালিত হয়। হোলি কেবলমাত্র রঙ ও উল্লাসের পর্ব না, বরং এর মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক বার্তা আছে। এই পর্ব আত্মশুদ্ধি, অন্যায়ের উপর ন্যায়ের বিজয় এবং প্রেম ও সদভাবনা বাড়ানোর প্রতীক। রাগ, দ্বেষ এবং নকারাত্মকতাকে অন্ত করে পুরনো রাগ ক্রোধকে ভুলিয়ে কোলাকুলি করার উৎসব। এই কারণে এটিকে সামাজিক উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি, আনন্দ এবং সংস্কৃতির সঙ্গম বলে পালন করা উচিত।

বর্তমান সময়ে হোলি কেবলমাত্র ভারতবর্ষে পালিত হয় তা নয়, এটি আন্তর্জাতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। নেপালে হোলিকে ফাগু পূর্ণিমা বলা হয়। প্রথম দিন হোলিকা দহন করে, পরের দিন রঙ খেলা হয় নেপালে। মরিশাসে বসবাসকারী ভারতীয়রা হোলি খুব ধুমধাম করে পালন করে থাকেন। ফিজিতে হোলিতে ধার্মিক আস্থার সঙ্গে জুড়ে রামায়ণ পাঠ এবং ভজন কীর্তন করে, মুখ মিষ্টি করা হয়। ক্যারাবিয়ান দেশ ট্রেনিডাড টাঙ্গো হোলিকে ফাগুয়া নামে পালন করা হয়ে থাকে। সিঙ্গাপুরে এবং মালেশিয়াতে হোলির আয়োজন মন্দির ও সংস্কৃতিক কেন্দ্রে করা হয়। আমেরিকা, ব্রিটেনে ফেস্টিভাল অফ কালারস আয়োজিত করা হয়ে থাকে এবং সেখানে ভারতীয়দের সঙ্গে বিদেশীরাও আনন্দ লাভ করে থাকেন। অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি ইতালি প্রভৃতি দেশে হোলি বর্তমানে একটি বড় সোশ্যাল ইভেন্ট হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে হোলি বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক উৎসব রূপে পালন করা হয় এবং আনন্দ উল্লাস দেখা যায় সেখানে। ■

রবিদাস জয়ন্তী পালন, তারকেশ্বর, মধ্যবঙ্গ

সন্ত রবিদাস জয়ন্তী পালন, বীরভূম, মধ্যবঙ্গ

হিন্দু সন্মেলন, মেদিনীপুর, দক্ষিণবঙ্গ

হিন্দু সন্মেলন, পটাশপুর, মেদিনীপুর, দক্ষিণবঙ্গ

বসন্ত পঞ্চমী—দেবী সরস্বতীর পূজন ও মদনোৎসব

ড. জয়ন্ত বিশ্বাস

বসন্ত ঋতুর আগমন মানে প্রকৃতির যৌবনের এক মনমোহক ছবি আমাদের সম্মুখে ভেসে ওঠে। এই কারণেই বসন্ত ঋতুকে সমস্ত ঋতুর রাজা বলা হয়। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে বিদ্যার দেবী মা সরস্বতী প্রকটিত হয়েছিলেন, বলে মানা হয়। আবার অনেকেই বলে থাকেন সৃষ্টিকর্তা ভগবান ব্রহ্মার মুখরাবিন্দ থেকে এই পবিত্র তিথিতে বিদ্যার দেবী অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী প্রকট হয়েছিলেন। আবার অনেকের ধারণা, ভগবান ব্রহ্মা সৃষ্টির রচনা করার পর ভূমণ্ডল পরিদর্শন করতে বেড়ান। সমস্ত রচনা অদ্ভুত সুন্দর হয়েও কেমন যেন একটা নিস্তব্ধতা অনুভব করলেন তিনি। এই নীরবতাকেই দূর করার জন্য ব্রহ্মা তাঁর কমণ্ডলু থেকে মন্ত্রপুতঃ জল বের করে পদ্ম ফুলের উপর ছিটিয়ে দেন। সেখান থেকে বীণা, পুস্তক, মালা ও কমল হস্তে, শ্বেতবস্ত্রধারিণী দেবী প্রকট হলেন। তখন ব্রহ্মদেব সেই দেবীকে বাগদেবী নাম দিলেন এবং শিক্ষা, শিল্পকলা ও সংগীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী করেন। ভগবান ব্রহ্মা সেই দেবীকে বরদান দিয়ে বলেন, 'তুমি সমস্ত পৃথিবীতে জ্ঞান এবং সংগীতের চেতনা জাগ্রত করবে এবং যে মানব তোমার আরাধনা করবে, সে বিদ্যালাভ করে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।' সেই কারণে দেবীর পূজার মন্ত্রে বলা হয়—

জয় জয় দেবী চরাচর সারে
কুচযুগ শোভিত মুক্তাহারে।
বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে
ভগবতী ভারতী দেবী নমস্ততে।।
নমঃ ভদ্রকাল্যৈ নমোনিত্যং, সরস্বতৈযেনমোনমঃ।
বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত বিদ্যা স্থানেভ্য এবচ।
এয স্বচন্দন পুষ্প বিল্ব পত্রাঞ্জলি সরস্বত্যৈত নমঃ।।

সমস্ত বিদ্যাভাষীরা, সাহিত্য সৃজকরা এই দিন অবশ্যই বীণাবাদিনী দেবী সরস্বতীর পূজা করে থাকেন। দেবীকে মা সারদা, বাগদেবী, বিরাজ, ব্রাহ্মী, শতরূপা, মহাশ্বেতা, পৃথুধর বাকেশ্বরী সহ অনেক নামে আরাধনা করা হয়।

সাধারণত শিক্ষা ও বিদ্যাকেই একই ভাবা হয়, কিন্তু এই দুইটি শব্দের অর্থ পৃথক। বাস্তবে বিদ্যা অর্জনের বিধি হচ্ছে শিক্ষা অর্থাৎ শেখার এবং শেখানোর ক্রিয়াকে শিক্ষা বলা হয়। শিক্ষা অর্জন দ্বারা আমরা অক্ষরের জ্ঞান, ভৌতিক জ্ঞান, লোকাচার এবং সমাজে বসবাস করার পদ্ধতি শিখতে পারি। কিন্তু বিদ্যা হচ্ছে ওই জ্ঞান ও পদ্ধতির সদুপয়োগ করে নিজের এবং সমাজের কল্যাণ সাধন করা। বিদ্যাকেই প্রজ্ঞা কিংবা গায়ত্রী অথবা জ্ঞান বলা যেতে পারে। কিন্তু লাভ করা জ্ঞানের প্রয়োগ যদি মানুষকে ঠকানোর জন্য কিংবা অপরাধ করার জন্য করা হয়, তাহলে তাকে জ্ঞানী বলা হয় না, তাকে দুরাচারী বলতে হয়। এই কারণে দেবী সরস্বতীর কাছে আমরা বিদ্যা এবং জ্ঞান প্রাপ্তির করার প্রার্থনা করে থাকি, শিক্ষার নয়। এই জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি ও কলার বরদান কেবলমাত্র সনাতনীদের প্রয়োজন, সেটা ঠিক না বরং প্রত্যেক সম্প্রদায়, মজহবের লোকেরও প্রয়োজন। সঠিক জ্ঞানের বা বিদ্যার অভাবের কারণে পৃথিবীর সমস্ত দুষ্কর্ম, অপরাধ, ঘৃণা, অশান্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইসব বিপথগামীদের কেবলমাত্র সঠিক বিদ্যা ও কলার দ্বারা সৎপথে আনা সম্ভব। বসন্ত পঞ্চমীর আয়োজন সনাতন ধর্মের ব্যাপকতা ও দূরদৃষ্টির প্রমাণ দেয়। বিশ্বের অন্য কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের এমন কোন উৎসব দেখা যায় না, যেখানে আরাধ্য দেবের কাছে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও কলার বরদান বা আশীর্বাদ চাওয়া হয়। এই কারণে আমাদের ঋষি মুনিরা এই ধরনের পূজা বা উৎসবের আয়োজন করেছিলেন, যার দ্বারা বিদ্যা ও জ্ঞানের আরাধনা করা হয় এবং বাস্তবিক বিকাশ ও শান্তি অর্জন করা সম্ভব।

বসন্ত পঞ্চমীর তিথিতে কামদেব এবং দেবীর রতী প্রথমবার মানুষের মনে প্রেমের সৃষ্টি করেছিলেন, তাই এই তিথিকে মদন উৎসবও বলা হয়ে থাকে। মান্যতা আছে বসন্ত ঋতুর এই মদন উৎসব ধীরে ধীরে রঙ খেলার এবং ফাগ উৎসব রূপে পরিবর্তিত হয়েছে। হিন্দিভাষীর ক্ষেত্রে এই উৎসব এক মাস ধরে চলে। পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপূজার মতো বিভিন্ন ধরনের প্যাণ্ডেল বানিয়ে মাতা সরস্বতীর পূজা করা হয়। মধ্যপ্রদেশে মেহর শহরে ত্রিকুট পর্বতের উপর মা সারদার মন্দির স্থাপিত আছে। এখানে মাতার মন্দিরকে শক্তিপীঠ বলে মান্যতা দেওয়া হয়।

মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থ ঋতুসংহার-এ এই মদন উৎসবের উল্লেখ আছে। সংস্কৃত নাটক কামদেবানুমান উৎসবে এর উল্লেখ আছে। ভবভূতির গ্রন্থ মালতি মাধব,গুপ্তকালীন এক গ্রন্থে, শুদ্রকে মৃচ্ছকটিকম নাটকের নায়িকা বসন্ত সেনার এই ধরনের উৎসবে অংশগ্রহণ করার উল্লেখ আছে। হর্ষচরিতের মধ্যে মদনমোহন উৎসবের উল্লেখ আছে। ভবিষ্যপুরাণে বসন্ত ঋতুতে কামদেব ও রতীর পূজার বর্ণনা আছে। এমন অনেক সাহিত্যের মধ্যে বিবরণ আছে, যে বসন্ত ঋতুর একমাস কালে মদন উৎসবের সময় যুবক-যুবতীরা তাদের জীবন সাথীর চয়ন করতেন এবং সমাজ তার মান্যতা দিত।

মনে করা হয় মদন উৎসবের প্রেরণা থেকে বিদেশীরা ভ্যালেন্টাইনস ডে পালন করেন প্রেমের দিবস রূপে। কিন্তু কালের ক্ষরণে এই দিবসটি ভোগবাদীদের দিবস হয়েছে, যার সুযোগে বিদেশি ব্যবসায়ীরা তাদের উৎপাদনকে বাজারে বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করে। অন্যদিকে প্রেমের পবিত্রতা কলুষিত হচ্ছে এবং সনাতনী সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানছে, এইসব কোম্পানির প্রচারে মায়াজালের বন্ধনে। সনাতনীদের সজাগ এবং সাবধানতার সঙ্গে নিজেদের আচরণ করা উচিত, যাতে সংস্কৃতির ক্ষরণ না করে প্রেমের উৎসব বা মদন উৎসব পালন করা যায়। ■

পরিষদ বার্তা

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় ‘বিশ্ব হিন্দু বার্তা’র স্টল, ২০২৬

গত ২২শে জানুয়ারি থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৩ দিনের আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলার আয়োজন হয়েছিল, সল্টলেকের করুণাময়ী বইমেলা প্রাঙ্গণে। প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ একটি স্টলে বিভিন্ন ধরনের ধার্মিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক পুস্তকের সম্ভারের প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়। জানা দরকার, গত ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ‘বিশ্ব হিন্দু পরিষদ’-এর নামে সরাসরি স্টল দেওয়া হয়নি, কিন্তু পরিষদের মুখপত্র ‘বিশ্ব হিন্দু বার্তা’র নামে স্টল দেওয়া হয়েছিল, সেই ভাবে এই বছরও তাই দেওয়া হয়েছে। এই স্টলে মানুষের জোয়ার দেখে বিধর্মীরা আয়োজকদের সামনে হুমকি দেয়, যে অবিলম্বে স্টল থেকে আর.এস.এস সম্পর্কিত এবং ধার্মিক পুস্তক বিক্রি করা বন্ধ না করে দিলে ঘেরাও করা হবে। সেই কারণে আয়োজকরা পুস্তকগুলোকে নিরীক্ষণ করে এবং তিন চারটি পুস্তক বিক্রি না করার জন্য অনুরোধ করে। এই অনুরোধে সাড়া দিয়ে বার্তা স্টল থেকে এই সমস্ত পুস্তক তুলে নেওয়া হয়। সবমিলিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই ছিল। এই স্টল চালানোর জন্য শ্রীদিলীপ কুমার ঝাঁওরের নেতৃত্বে, শ্রীদীপক চৌধুরী, শ্রীসৌগত বসু, শ্রীঅর্ণব কুমার দে, শ্রীজয়ন্ত ভৌমিক, শ্রীচন্দন গুপ্তা, শ্রীঅঙ্কিত ব্যানার্জি, সুশ্রী পারমিতা পাল, শ্রীমতি গৌরী মিত্র প্রভৃতি তাঁদের শ্রমদান করেছেন। শ্রীসোহান সিং সোলাঙ্কী, ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক এই স্টলের উদ্বোধন করেন। এছাড়া শ্রীঅমিয় সরকার ক্ষেত্র সম্পাদক, শ্রীজয়ন্ত বিশ্বাস, শ্রীসুবীর সান্যাল, শ্রীচন্দন নাথ দাস, শ্রীমানিকচন্দ্র পাল, শ্রীবিজয় পাতর, শ্রীঅনুপ মণ্ডল, শ্রীবাবুই নস্কর, শ্রীমতি বর্ণালী ব্যানার্জি, শ্রীসুধাংশু পাত্র, শ্রীগৌতম সরকার, শ্রীঅমল চক্রবর্তী প্রমুখ আধিকারিকরা সময় সময়ে আসেন। প্রান্তের বিভিন্ন জেলা থেকে সদস্য ও আধিকারিকরাও বই কেনার জন্য আসেন। এই বছরের বার্তার স্টলে শ্রীঅর্ণব কুমার দে এবং সৌকলিন মাঝি দ্বারা লিখিত ‘বার্নিং বেঙ্গল’ নামক পুস্তকটির বিমোচন করা হয়, ড. মধুসূদন পাল মহাশয় দ্বারা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ এবং মধ্যবঙ্গ প্রান্ত থেকে অনেকেই এইবার পুস্তক মেলায় বার্তার স্টলে উপস্থিত হয়ে উৎসাহ প্রদান করেন।

হিন্দু সম্মেলন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (RSS) শতবর্ষ উদযাপনের একটি কার্যক্রম রূপে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলার প্রখণ্ড স্তরে বিরাট হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করবে বলে স্থির করেছে। এই উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ সহকারে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে হিন্দু সম্মেলন করা হচ্ছে। যেখানে স্থানীয় সাধু-সন্ত, মা-বোনেরা ও সাধারণ মানুষ অত্যন্ত উৎসাহ দেখাচ্ছে এবং অংশগ্রহণ করে তাদের সমর্থন জানাচ্ছে। হিন্দু সমাজের মধ্যে এই পরিবর্তন অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও প্রেরণাদায়ক বলে মনে করা হচ্ছে।

চৈতন্যলীলায় দোল মহোৎসব

রবিব্রত ঘোষ

দোল উৎসব মূলত হিন্দু বৈষ্ণবদের উৎসব। বৈষ্ণব বিশ্বাস অনুযায়ী, এ দিন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাধিকা এবং তার সখীদের সঙ্গে আবির খেলেছিলেন। সেই ঘটনা থেকেই দোল খেলার উৎপত্তি। এ কারণে দোলযাত্রার দিন এ মতের বিশ্বাসীরা রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ আবিরে রাঙিয়ে দোলায় চড়িয়ে নগর কীর্তনে বের হন। এ সময় তারা রং খেলার আনন্দে মেতে ওঠেন।

বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাসের রচনায় তার নানা উল্লেখ মেলে—

"খেলত ফাগু বৃন্দাবন-চান্দ।
ঋতুপতি মন মথ মন মথ ছান্দ।।
সুন্দরীগণ কর মণ্ডলী মাঝ।
রঙ্গিনি প্রেম তরঙ্গিনী সাজ।।
আগু ফাগু দেই নাগরি-নয়নে।
অবসরে নাগর চুম্বয়ে বয়নে।।"

আবার এই দিনটাকে গৌড়পূর্ণীমাও বলা হয়। কারণ ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি শনিবার দোল পূর্ণিমা তিথীতেই শ্রীচৈতন্য মহা প্রভুর জন্ম হয়েছিল।

বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে একটা দেশের জাতীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় ইতিহাসে কি পরিমাণ আলোড়ন তৈরি হতে পারে তা একমাত্র চৈতন্যদেবের জীবনকে পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়।

অথচ এই মানুষটির কোন আর্থিক ক্ষমতা ছিল না, নিজে মন্ত্রীও ছিলেন না শাসকও ছিলেন না যে মানুষকে কিছু পাইয়ে দেবেন বা অত্যাচার করবেন মানুষ ভয় কিংবা লোভে তার কাছে তার বশত্যা স্বীকার করবে।

চৈতন্যজীবনী পড়লে বোঝা যাবে সংকীর্তনকে যারা বিশ্বাস করত না তাদের কাছে এটা একটা উদ্ভট এবং আজব জিনিস বলেই মনে হত। চৈতন্যদেবের ভাববস্থাকে অনেকে বুঝতেই পারেননি।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময় বাংলার সমাজ সংস্কৃতি এবং ধর্মের অবস্থা ছিল ভয়ংকর। সামাজিক দিক দিয়ে বাংলা ছিল অন্য প্রদেশের মতোই জাতপাতের বেড়াজালে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া একটি সমাজ। সংস্কৃতির দিক দিয়ে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে বিদ্যার্চনার ঐতিহ্য ছিল। নবদ্বীপ ছিল বাংলার অক্সফোর্ড। কিন্তু এই তাত্ত্বিক আলোচনার কোন প্রয়োগিক দিক কখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। সমাজের সংকটে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা খুঁজলে দেখা যাবে সেই বুদ্ধিজীবরা তাত্ত্বিক আলোচনাই করে গেছেন কোন সমাধানের পথ দেখাতে পারেননি। ধর্মের দিক দিয়েছিল সবচেয়ে ভয়ংকর অবস্থা। ধর্ম বলে যাকে চালান হতো সেটা পুরোপুরি একটা অনাচার এবং কদাচারের সাথেই ছিল মুসলিম শাসকদের অত্যাচার। এই অত্যাচার এবং প্রলোভন এবং জাতিভেদ প্রথা তীব্রতা বেড়ে গেলে হাজার হাজার মানুষ মুসলিম ধর্মেই আশ্রয় খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেন।

এই জায়গা থেকেই চৈতন্যদেবের এক নতুন ধর্মের সূচনা যে ধর্ম বৃথা তাত্ত্বিক আলোচনায় গুরুত্ব দেননি, আনুষ্ঠানিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে আচার সর্বস্ব হয়ে দাঁড়ায়নি। বলা যেতে পারে যে ধর্ম, ধর্মের সঙ্গে মানুষের হৃদয়কে মেলাতে পেরেছিল। ভগবান যে ভয় পাবার কিছু নয়, ভগবান যে আমাদের একান্ত আপন আরো ভালোভাবে বললে বলতে হয় ভগবানই আমাদের স্বরূপ। চৈতন্য প্রচারিত ধর্ম সে কথাই বলে। যে ভগবানকে লাভ করতে গেলে আচার-আচরণই শেষ কথা নয়, পূজার মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে নিজের বৈভব প্রদর্শনী শেষ কথা না, তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভগবানের জন্য ভক্তি ও ভালোবাসা।

নিজের জীবন দিয়ে চৈতন্যদেব এটাই দেখিয়েছিলেন। আচরণ থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভগবানের বিয়োগ ব্যাথাকে নিজের মধ্যে তীব্রভাবে অনুভব করা এবং পাবার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ করা।

আর ভগবানের কাছে সবার অবারিত দ্বার এখানে জাতি, কুলমানের কোনও প্রশ্রয়ে নেই। তাই চৈতন্য প্রচারিত ধর্মে যেমন বর্ণ হিন্দুরা ছিলেন তেমন অন্তজরাও ছিলেন, এমনকি অহিন্দু যারা তারাও চৈতন্যদেবের পদপ্রান্তে এসে আশ্রয় লাভ করেছিলেন। চৈতন্যজীবনী

পড়লে দেখা যায় চৈতন্যদেবের হরিনাম সংকীর্তনে বনের পশু পাখি ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তুরাও শান্ত হতে পেরেছিল।

আচার-আচরণ এদের গণ্ডিটাকে এক লহমায় চূর্ণ করে দিয়ে ধর্মকে সব মানুষের মিলনক্ষেত্রে পরিণত করার চৈতন্যদেবের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল। বিদেশি বিধর্মী ধর্ম বিরোধীদের দাপটের সামনে চোখে চোখ রেখে কথা বলেছিলেন প্রেম ও ভক্তি নিয়ে।

নগরের কাজী আপত্তি করছেন সংকীর্তনে, চৈতন্যদেব প্রতিবাদ করে উঠলেন কোন অস্ত্র ছাড়াই নাম সংকীর্তন এবং খোল করতাল নিয়ে নগর পরিক্রমা করলেন। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে দেখে কাজী আগের আদেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম একটি অহিংস আন্দোলন হয়েছিল যেটা একটি গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন। প্রায় ৬০০ বছর পরে দাঁড়িয়ে আমরা বুঝতে পারি সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের নিয়ে প্রকৃত মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে প্রকৃত গণতন্ত্রের একটা ভিত্তি ভূমি তৈরি করে দিতে পেরেছিলেন এবং সেটি এসেছিল একজন আধ্যাত্মিক মানুষের কাছ থেকে।

খালি আন্দোলনই নয় বরং বলা যেতে পারে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে গোটা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গিয়েছিল। নতুন ধরনের ধর্মীয় সাহিত্য রচনা করা শুরু হয়েছিল যার মধ্যে অশ্লীলতা ছিল না, কদাচার ছিল না, অনাচার ছিল না। সাধারণ মানুষ পেয়েছিল আড়ম্বরহীন এক সহজ সরল ধর্মমত যাতে মানুষ সহজভাবেই অংশগ্রহণ করতে পারে। সমাজব্যবস্থা পেয়ে গিয়েছিল জাতপাত বাঁধন ভেঙ্গে দেব এক নতুন ধরনের সমাজ। নতুন রঙ লেগে ভারতীয় সমাজে। যার পরতে পরতে লেখা ছিল মানবিকতা। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

বঙ্গদেশে দোল উৎসবের সুচনা শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল। ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুরীধাম ত্যাগ করে বৃন্দাবন গিয়ে সেখানকার রঙ খেলা দেখে অভিভূত হয়ে এই বাংলায় দোল উৎসবের সুচনা করেন। মহাপ্রভু বাঙলায় এসে বিধান দিলেন, এ দিনটায় ভক্তেরা কৃষ্ণমন্দিরে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে রঙ, আবির দেবে তারপর সেই রঙ, আবির নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে খেলবে। এ ভাবেই মহাপ্রভু বাঙলায় 'শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা' উৎসব প্রবর্তন করেছিলেন। 'দোলযাত্রা' কথাটার তাৎপর্য হল, শীত চলে গেছে, মানুষ আবার কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে। মনে নানান চিন্তা, নানান ভাবনা আসছে। নূতন নূতন কল্পনা জাগছে শ্রীকৃষ্ণের কথা ভাবতে গিয়ে মন আনন্দে ভরে উঠছে। সে ভাবনায় মনে দোলা লাগছে। মন আন্দোলিত হচ্ছে ভক্তের মনও দুলছে, তা তো নয়, ভক্তের মনের দোলা ভক্তের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মনকেও দুলিয়ে দিচ্ছে। ভগবানের মনে সাড়া তুলছে এই হল শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা চৈতন্য সমসাময়িক পদাবলীকারদের মধ্যে দোল উৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায়। দীন কৃষ্ণদাস লিখছেন—

'দোহে দোহে ফাগু খেলে হোরি হোরি ধ্বনি।
গদাধর সহ খেলে গোরা দ্বিজমণি।'

অবশ্য আশেপাশের অন্যান্যরা—নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত প্রমুখও খেলায় মাতোয়ারা। 'ক্ষণে গালি ক্ষণে কেলি প্রেমে মাতোয়াল।' এ যেন একদল ছেলে-বুড়ো দোলের দিন পথে নেমেছে। পরস্পরকে আবির মাখাতে-মাখাতে হুল্লোড় চলছে পথে। তবে এই পরিবেশের মধ্যেও দুজন যেন কিছুটা আলাদা— গদাধর সহ খেলে গোরা দ্বিজমণি।' ভিড়ের মধ্যেও নিজস্ব গণ্ডি তৈরি করে নিয়েছেন তাঁরা।

এই নিজস্ব গণ্ডির আভাস দেখা যায় শিবানন্দ সেনের পদেও— 'হোলি খেলত গৌরকিশোর।
রসবতী নারী গদাধর কোর।।
স্বেদবিন্দু মুখে পুলক শরীর।'

ভাবভরে গলতহি নয়নে নীর। গৌরকিশোর অর্থাৎ গৌরাঙ্গের কোলে অধিষ্ঠিতা গদাধর। হোলি খেলছেন দুজনে। মুখে বিন্দু-বিন্দু ঘাম, শরীরে পুলক। কখন ভাবাবেশে গলে যাচ্ছেন, কখন আবার চোখে জল। প্রচ্ছন্নে কামের ইঙ্গিত। শিবানন্দ সেন ছিলেন গৌর-পার্ষদ, নিমাই-এর নবদ্বীপলীলা প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। ফলে তাঁর লেখা পদে বাস্তবের প্রতিফলন আশা করা অন্যায় নয়। রং মাখিয়ে দেওয়ার পর, যখন প্রাথমিক সংকোচ ঘুচে গেছে, গৌরাঙ্গের কোলে বসেছেন গদাধর। রংমাখা মুখে ঘাম, শরীরে কৌতূহল—না-জানি কী হবে এরপর! দুরুদুরু-বুকের এই মুহূর্তগুলোই তুলে ধরেছেন শিবানন্দ। সঙ্গে, ভণিতায় লিখতে ভোলেননি—'শিবানন্দ কহে পহুঁ শুনি রসবাণী।/যাঁহা পহুঁ গদাধর তাঁহা রসখনি।।' যেখানে প্রভু (গৌরাঙ্গ) ও গদাধর, সেখানেই রসখনি। এ-রস নিছক ভাবরস নয়, প্রেমরসও বটে।

এদিকে মনোহর দাসের পদে দেখি, গৌরাঙ্গের অন্যান্য পার্ষদরা গৌর-গদাধর সম্পর্ককে অত্যন্ত সহজভাবেই নিয়েছেন। সেবার দোলের দিন, নদীর পাড়ে দুই দলে ভাগ হয়ে চলছে খেলা। একদলের প্রধান গৌরাঙ্গ, অন্যদলের গদাধর। নারী-পুরুষে যেমন খেলা হয় আরকি! গদাধরের দলে রয়েছেন স্বরূপ দামোদর, বাসু ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ প্রমুখ। আর গৌরাঙ্গের দিকে গৌরীদাস পণ্ডিত-সহ অন্যরা। প্রথমে গৌরীদাসের দল চন্দনকাঠের পিচকারিতে রং ভরে গদাধরের শরীরে ছিটোয়—'গৌরীদাস আদি করি/চন্দন পিচকাভরি/গদাধর অঙ্গে দেয় পেলি।' বদলা নিতে এবার এগোলেন স্বরূপ দামোদরও—'স্বরূপ নিজগণ সাথে/আবীর লইয়া হাতে/সঘনে পেলায় গোরা-গায়।'

খেলার শেষে শুরু খুনসুটি। গৌরীদাসের দাবি, জিতেছে তাঁদের দলই—'গৌরীদাস খেলি খেলি/গৌরাঙ্গ জিতল বলি/করতালি দিয়া আগে ধায়।' এতে আবার স্বরূপের গোঁসা হয়। প্রতিবাদ করে বলেন—'রুষিয়া স্বরূপ কয়/হারিলা গৌরাঙ্গরায়/জিতল আমার গদাধর।' বাংলা বা হিন্দি সিনেমার গানে, নারী-পুরুষ দু-দলে ভাগ হয়ে যেমন খুনসুটি-ঝগড়ার দৃশ্য দেখা যায়, মনোহর দাসের পদেও ঠিক তেমন ছবি।

এর পরের পদটি গোবিন্দদাসের। পটভূমি নবদ্বীপ নয়, নীলাচল। অর্থাৎ, গৌরাঙ্গ ততদিনে সন্ন্যাসী, হয়েছেন 'চৈতন্য'। তারপরও, দোলের দিনে 'ফাগু' ওড়ায় কমতি নেই। এমনকী, গদাধরকে দেখে মৃদু-মৃদু হাসছেনও তিনি—

'কত কত ভাব বিথারল অঙ্গ।
নয়ন ঢুলাঢুলি প্রেমতরঙ্গ।।
হেরি গদাধর লহু লহু হাস।
সো নাহি সমুঝল গোবিন্দদাস।।'

গোবিন্দদাস প্রকাশ্যে 'বুঝলাম না' বলে হাত তুলে নিলেও, ভেতরে-ভেতরে লীলাটি ঠিকই বুঝেছেন। চতুরের মতো ইঙ্গিত দিয়ে থেমে গেলেন—'হেরি গদাধর লহু লহু হাস।' বাকিটা যারা বোঝার, বুঝে নিক গে।

গৌরাঙ্গর দোলখেলা নিয়ে চারজন পদকর্তার মধ্যে একমাত্র শিবানন্দ সেন ছাড়া সকলেই পরবর্তী সময়ের মানুষ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই কারো। প্রচলিত কথা শুনে ও পঞ্চতত্ত্বের প্রভাবে গৌর-গদাধর লীলা লিখেছেন। কিন্তু শিবানন্দ সম্ভবত সেসবের প্রত্যক্ষ সাক্ষী, আর তাঁর বর্ণনাই সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক। ■

বারাসাতে ডেপুটেশন, দক্ষিণবঙ্গ

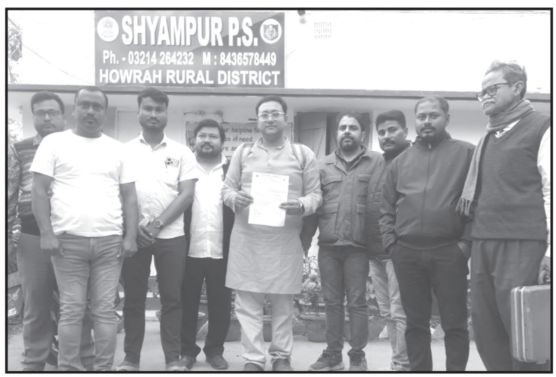

শ্যামপুর থানায় ডেপুটেশন, দক্ষিণবঙ্গ

স্বামী বিবেকানন্দ জন্মদিবস পালন, ভগবানপুর, দক্ষিণবঙ্গ

বজরঙ্গ দলের ত্রিশূল দীক্ষা কার্যক্রম, দক্ষিণবঙ্গ

শিব উপাসনার পর্ব—শিবরাত্রি

রাজকুমারী মাহেশ্বরী

পৌরাণিক কথা অনুসারে, ফাল্গুন মাসের ত্রয়োদশী এবং চতুর্দশী তিথির মধ্য রাত্রিতে শিবলিঙ্গের আবির্ভাব হয়েছিল, তাই এই দিনটিকে শিবরাত্রি রূপে পালন করা হয়। ভগবান বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মাজীর জন্ম হয়, কিন্তু ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে তার বিবাদ শুরু হলে হঠাৎই এক অদ্ভুত জ্যোর্তিলিঙ্গ রূপে শিব দৃশ্যমান হয়। এই অদ্ভুত লিঙ্গের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের কোন হদিশ পাওয়া গেল না। তখন দেবতারা নিরাশ হয়ে সেই জ্যোতির্লিঙ্গের কাছেই তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে, জানা যায় তিনিই শিব এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উৎপন্নকারী দেব। তখন থেকেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং সমস্ত দেবতারা ভগবান শিবের মহত্ব স্বীকার করে শিবলিঙ্গের পূজা চালু করেন। এই কারণে শিবকে আদি দেবও বলা হয়ে থাকে। আদি অর্থাৎ প্রারম্ভ। আদিনাথ হওয়ার কারণে ওঁনার আরেক নাম আদিশ। শিব অর্থাৎ কল্যাণকারী এবং সহজ-সরল (ভোলা), তাই ওঁনাকে ভোলানাথও বলা হয়ে থাকে। তিনি সহজেই প্রসন্ন হন, তাই ওঁনাকে দেব না বলে, মহাদেব বলা হয়। শিব নিজে বৈভব থেকে দূরে থাকেন, কিন্তু ভক্তদের বৈভব প্রদান করেন। যদিও তার একমাত্র বাহন নন্দী এবং সম্পদের মধ্যে কেবলমাত্র মৃগছাল, কমণ্ডলু এবং ত্রিশূল রাখেন। আবার তিনি ত্রিলোকেশ্বর হয়েও নিজে পাহাড়ে নির্জন স্থানে বসবাস করেন। গলায় সংসারের কষ্টদায়ী বিষ পান করে নীলকণ্ঠী হয়েছেন তিনি, এবং শেষনাগের ভাই বাসুকীকে ধারণ করে বাসুকীনাথ হয়েছেন।

শিব যেখানে কল্যাণের প্রতীক, সেখানে রাত্রি অজ্ঞানের অন্ধকারের এবং নৈতিক পতনের ঘোষক। কিন্তু শিব মানব মাত্রকে সত্যজ্ঞানের দ্বারা অন্ধকার থেকে জ্ঞান রূপী প্রকাশের দিকে নিয়ে যান। এই কারণে শিবরাত্রি আস্থা, সাধনা এবং উর্জ্জার পর্ব। শিবরাত্রি কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক পর্ব না, এর অত্যন্ত গহন অর্থ আছে যা রহস্যময়ও বটে। সম্ভবত বিশ্বের একমাত্র পর্ব, যার মধ্যে পূর্ণ বিরোধাভাসের মধ্যে অতুলনীয় সন্তুলন পাওয়া যায়। একদিকে শিবের তাণ্ডব নৃত্যকে বিনাশের নৃত্য রূপে মানা হয়, আবার সেইটিকেই নবসৃজনের ভিত্তিও বলা হয়, আবার শিবের গলায় হলাহল বিষ আছে, তো জটায় গঙ্গার শীতল জল ধারা বইছে, যা সৃষ্টির রক্ষা ও পুনঃনির্মাণের প্রতীক। কৈলাস পর্বতে তপস্যারত যোগী আবার মাতা পার্বতী, পুত্র গণেশ ও কার্তিককে নিয়ে গৃহস্থ ধর্ম পালনকারী শিবকে আমরা জানি। শিব শরীরে বিভূতি বা ভস্ম লাগান, আবার মাথায় চন্দ্রমার স্নিগ্ধতাকে ভালবাসেন। শিব ভগবান ভূত-প্রেতের স্বামী, আবার দেবতাদের দেবাদিদেব মহাদেব। বিশ্বের অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে, কিংবা কোন দেব-দেবীর মধ্যে এই রকম বিরোধাভাসের মধ্যে এমন সন্তুলন কখন পাওয়া যায় না। শিব ঠাকুরের পরিবারও কিন্তু বিরোধাভাসের পরিবার। যেমন—মাতা পার্বতীর বাহন সিংহ, কিন্তু শিবের বাহন নন্দী বলদ, আবার শিব পুত্র কার্তিকের বাহন ময়ূর। শিবের গলায় থাকে বাসুকিনাগ, অন্যদিকে গণেশের বাহন মুষিক বা ইঁদুর। সাপ মুষিক ভক্ষণকারী, আবার ময়ূর ও সাপ পরস্পর বিরোধী অর্থাৎ বিরোধাভাসের কিংবা বৈচারিক ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও, পরিবারের মধ্যে একতা দেখা যাচ্ছে, এমনটাই ভারতের জনমানসের মধ্যে আছে।

শিবরাত্রিতে ধ্যান বা যোগ সাধনা কেন করা হয়? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের ধর্মগ্রন্থ দিয়েছে, যা বর্তমানে বিজ্ঞানসিদ্ধ। বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করেছে যে শিবরাত্রিতে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ এমন স্থিতিতে থাকে যে, এই সময় মানব শরীরের উর্জ্জার প্রবাহ প্রাকৃতিক রূপে উর্ধ্বগামী হয়। এই উর্জ্জাকে জাগ্রত করার জন্য মেরুদণ্ডকে সোজা রেখে বসে ধ্যান করার পরম্পরা আছে। আধুনিক Neruscience-এর মতে এই রাত্রে ধ্যান করলে, মস্তিষ্কের আলফা ওয়েভ সক্রিয় হয়, যা মানসিক স্থিরতা এবং আন্তরিক শান্তি প্রদান করে। আবার শিবলিঙ্গের উপর জল ও দুধ ঢালা একদিকে যেমন ধার্মিক কীর্তি ভাবা হয়, তেমনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এর ফলে মস্তিস্ক এবং তন্ত্রিকাগুলোকে শীতলতা প্রদান করে। বেলপাতা স্পর্শ মস্তিষ্কের শীতলতা প্রদান করে। সিদ্ধি বা ভাঙের পাতা, ধুতুরা, আর্কপত্র সাধারণত ছোঁয়া হয় না, কিন্তু শিবরাত্রিতে শিব পূজার জন্য এইগুলো স্পর্শ করা হয়। ফলে এই সব কিছুর ঔষধিগুণ মানুষের শরীর লাভ করে। বর্তমান সময়

যোগ ও ধ্যান বৈশ্বিক মান্যতা প্রাপ্ত করেছে। এই কারণে শিবরাত্রির গুরুত্ব আরো বেড়েছে, কারণ শিবই আদি যোগী এবং যোগবিদ্যার প্রথম গুরু। শরীরে ফিটনেস রাখার জন্য কাওঁড় যাত্রা একটি ভালো মাধ্যম। শিব ঠাকুর ও পরিবেশের অদ্ভুত সমন্বয়, নন্দী, সাপ, গঙ্গা, হিমালয়, চন্দ্রমা ইত্যাদি প্রাকৃতিক সংসাধনের সংরক্ষণের বার্তা আমাদেরকে দেয়।

ভগবান শিব সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে—

১) শিবের পুত্র বলতে আমরা সাধারণত কার্তিক এবং গণেশের নাম জানি। কিন্তু এছাড়াও সুকেশ, জলন্ধর, আইয়াপ্পা এবং ভূভা প্রভৃতিদের জন্মকথা আরও রোচক (Interesting)।

২) ভগবান শিব গুরু শিষ্যের পরম্পরা শুরু করেন। ওঁনার সাত জন শিষ্যকে সপ্তঋষি বলা হয়। তাঁরা হলেন বৃহস্পতি, বিশালক্ষ, শুক্র, সহাশ্রুশ্ব, মহেন্দ্র, প্রাচেতস, মনু, ভরদ্বাজ এবং অষ্টম শিষ্য ছিলেন গৌরশিরস মুনি। এঁনারা শিবের জ্ঞানকে সম্পূর্ণ পৃথিবীতে প্রচারিত করেন।

৩) শৈব পন্থের প্রচারক : শিবের ৮ জন শিষ্য ব্যতিরেক কার্তিকেয়, নন্দি, অগস্ত্যমুনি, ভৈরবনাথ, বীরভদ্র, মনিভদ্র, চন্দিশ, ভৃগীরিঢ়ি, সৃঙ্গি, শৈল্য, গোকর্ণ, ঘন্টা কর্ণ, বান, রাবণ, জয় এবং বিজয় ছিলেন। এই পরম্পরার বৃদ্ধি ও প্রচারক রূপে আদিগুরু ভগবান দত্তাত্রেয়, আদি শঙ্করাচার্য, মৎস্যনেন্দ্রনাথ, গুরু গোরক্ষনাথের নাম প্রমূখ রূপে বলা হয়।

৪) শিবের পঞ্চায়েত : ভগবান সূর্য, গণপতি, দেবী, রুদ্র এবং বিষ্ণুকে শিব পঞ্চায়েত বলা হয়।

৫) শিবের দ্বারপাল : নন্দী, স্কন্ধ, রিঢ়ি, বৃষভ, ভৃঙ্গি, গণেশ এবং মহাকাল।

৬) শিবের অবতার : বীরভদ্র, পিপ্যলাদ, নন্দী, ভৈরব, মহেশ, অশ্বথামা, শরোভাবতার, বৃহস্পতি, দুর্বাসা, হনুমান, বৃষভ, যতিনাথ, কৃষ্ণ দর্শন, অবধুত, সুরেশ্বর, কিরাত, সুনটনর্তক, ব্রহ্মচারী, যক্ষ, বৈদ্যনাথ, দিজেশ্বর, হংসরূপ, নটেশ্বর ইত্যাদি।

৭) রুদ্র অবতার : বেদে ১১টি রুদ্র অবতারের বর্ণনা আছে। যথা—কপালি, পিঙ্গলা, ভীম, বিরুপাক্ষ, বিলোহিত, শাস্তা, অজপাদ, অপিবুর্ধ্য, শম্ভু, চন্ড এবং ভবঃ।

৮) দেবতা এবং অসুর দুইই শিবভক্ত : ভগবান শিব দেবতা এবং অসুর, দানব, রাক্ষস পিশাচ, গন্ধর্ব, যক্ষ আদি শিবের পূজা করেন। শিব একদিকে রাবণকে বরদান করেছিলেন, তেমনি শ্রীরামচন্দ্রকেও বরদান করেছিলেন। ভস্মাসুর, শুক্রাচার্য আদি অসুরকে বরদান দিয়েছিলেন। সব আদিবাসী, বনবাসী, জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং সমাজের সর্বোচ্চ দেবতা হলেন শিব।

৯) শিবের বেশভূষা এমনই যে, প্রত্যেক ধর্মের লোকই তাঁর মধ্যে নিজের প্রতীক চিহ্ন খুঁজে পান। মুশারিক, যজিদি, সার্বিঁইন, সুবি, ইব্রাহিমি ধর্মের মধ্যে শিবের অস্তিত্বের স্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। শিবের শিষ্যরা শৈব্য, সিদ্ধ, নাথ, দিগম্বর এবং সুফি সম্প্রদায়ের সকলেই শিবকে সৃষ্টিকর্তা বলে ভাবে।

১০) শিব ভক্ত : ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং সমস্ত দেব-দেবী শিবের যেমন ভক্ত, তেমনি ভগবান রাম এবং কৃষ্ণ শিবের অনন্য ভক্ত ছিলেন। হরিবংশ পুরাণ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ কৈলাস পর্বতের উপর শিবকে প্রসন্ন করার জন্য তপস্যা করেছিলেন। আবার রামায়ণ কালে ভগবান রাম রামেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে পূজার্চনা করেছিলেন।

১১) শিবলিঙ্গের উপর বিল্বপত্র চড়িয়ে, ওঁম নমঃ শিবায়ঃ কিংবা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পাঠ করা উচিত। সোমবার প্রদোষ এবং শ্রাবণ মাসে ব্রত রাখা হয়। শিবরাত্রি এবং মহা শিবরাত্রি শিবের প্রমুখ পর্ব বা উৎসব।

১২) ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গ : এগুলো হল, সোমনাথ, মল্লিকার্জুন, মহাকালেশ্বর, ওঙ্কারেশ্বর, বৈদ্যনাথ, ভিমাশঙ্কর, রামেশ্বর, নাগেশ্বর, কাশি বিশ্বনাথ, ত্রয়ম্বেকশ্বর, কেদারনাথ, ঘৃন্নেশ্বর। শিব পুরাণ অনুসারে ব্রহ্ম, মায়া, জীব, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবীকে জ্যোতির্লিঙ্গ কিংবা জ্যোতি পিণ্ড বলা হয়েছে।

১৩) শিবগ্রন্থ : বেদ, উপনিষদ, শিবপুরাণ, শিব সাহিত্যের মধ্যে শিবের সম্পূর্ণ শিক্ষা এবং দীক্ষা সমাহিত আছে। বিজ্ঞান ভৈরব তন্ত্রে ভগবান শিব দ্বারা মাতা পার্বতীকে শোনানো ১২২টি সূত্রের সংকলন করা আছে।

১৪) শিবের ১০৮টি নামের উল্লেখ পুরাণে আছে। তার মধ্যে বিশেষ প্রচলিত হচ্ছে—মহেশ, নীলকণ্ঠ, মহাদেব, মহাকাল, শংকর, পশুপতিনাথ, গঙ্গাধর, নটরাজ, ত্রিনেত্র, ভোলানাথ, আদিদেব, আদিনাথ ত্রিয়ম্বক, ত্রিলোকেস, জটাশঙ্কর, জগদীশ, প্রলয়ঙ্কর, বিশ্বনাথ, বিশ্বেশ্বর, হর, শিব, শম্ভু, ভূতনাথ এবং রুদ্র।

১৫) শিবের দর্শনীয় স্থান : জম্মু কাশ্মীরের অমরনাথ গুহা, শ্রীলংকার রত্নদ্বীপ পাহাড়ে শিবানোলীপদম,

তামিলনাড়ুর থিরুবন্নামলাই, শ্রীস্বেদারন্যেশ্বর, আসামের তেজপুরে রুদ্রপাদো মন্দির, উত্তরাখন্ডের আলমোড়ার জাগেশ্বর, রাচীর পাহাড়ী বাবামন্দির, তিব্বতের কৈলাস পর্বত এবং মানস সরোবর এবং ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গ বিশেষভাবে বলা হয়। এছাড়া ভারতবর্ষ এবং নেপাল তথা অনেক দেশের শিব মহিমা দর্শন পাওয়া যায়।

বাস্তবে শিব ভক্তরা বলে থাকেন, শিবের অতিরিক্ত সংসারে কোন কিছুইর মান্যতা নেই। শিব আদি, অনন্ত এবং সৃষ্টির কর্তা ও বিনাশ কর্তা। যখনই অধর্মের প্রভাব পৃথিবীর উপর বাড়ে, তখনই শিব তাঁর তৃতীয় নয়ন দ্বারা পুরনো সৃষ্টির বিনাশ করে, নতুন সৃষ্টির নির্মাণ করেন। এই জন্যই বলা হয়, সত্যমঃ শিবমঃ সুন্দরমঃ। ■

পরিষদ বার্তা

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দলের শ্যামপুর থানায় ডেপুটেশন

হাওড়া গ্রামীণ সাংগঠনিক জেলায় শ্যামপুরে হিন্দু মন্দিরে গরুর মাংস ফেলে অপবিত্র করার প্রতিবাদে থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। হাওড়া গ্রামীণ জেলার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ/বজরঙ্গ দলের কার্যকর্তারা এবং দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বজরঙ্গ দলের কার্যকর্তারা ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ/বজরঙ্গ দলের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান

বারাসাত ময়না গোদি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, সরস্বতী পূজা বন্ধ এবং দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বিভিন্ন জেলায় সাধু সন্তদের উপর আক্রমণ। মন্দিরে গোমাংস ফেলে যাওয়া। বিভিন্ন সময়ে আমাদের কার্যকর্তাদের দোকান বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া এবং পুলিশি হেনস্থার বিরুদ্ধে, বারাসাত প্রখণ্ডের পক্ষ থেকে বারাসাত ডি.এম অফিসে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

মকর সংক্রান্তির পূণ্যস্নান

প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সুন্দরবন জেলার পরিচালনায় মন্দির বাজার প্রখণ্ডর ব্যবস্থাপনায় পৌষ সংক্রান্তি ও মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নান মেলা উপলক্ষে সাউথ বিষ্ণুপুরে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী জল, ছোলা, বাতাসা ও খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করে সেবা কাজ করা হয়।

দুর্গাবাহিনী ও মাতৃশক্তির বৈঠক

বিগত ৩১/১/২৬ ও ১/২/২৬ গুজরাটের কর্ণাবতী ক্ষেত্রে সম্পন্ন হল অখিল ভারতীয় দুর্গাবাহিনী ও মাতৃশক্তি বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের দুর্গাবাহিনী ও মাতৃশক্তি পালক সহ দুর্গাবাহিনী প্রান্ত সংযোজিকা, মিলন কেন্দ্র প্রমুখ ও বাল সংস্কার কেন্দ্র প্রমুখ । এছাড়াও দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের মাতৃশক্তি সংযোজিকা, সৎসঙ্গ প্রমুখরা। উপস্থিত ছিলেন মধ্যবঙ্গ প্রান্তের দুর্গাবাহিনী সহ-সংযোজিকা। বৈঠক উদঘাটন সত্র হয় ৩১ তাং সকাল ৯টায় এবং সমাপন সত্র হয় ১তাং দুপুর ২টায়।

সামাজিক সমরসতা কার্যক্রম

গত ২৬শে জানুয়ারি ২০২৬, উত্তর বীরভূম জেলার নারায়ণপুর প্রখণ্ডে হয়ে গেল সামাজিক সমরসতা কার্যক্রম। উপস্থিত ছিলেন গ্রামীণ খণ্ড প্রখণ্ড জেলা প্রান্ত ক্ষেত্রের বিশিষ্ট কার্যকর্তাগণ। মাতৃশক্তির উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

গুরু রবিদাস জয়ন্তী পালন

সন্ত শিরোমণি গুরু রবিদাস জয়ন্তী সমরসতা দিবসরূপে পালন করা হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ৭ দিন ব্যাপী সমরসতা অভিযান হিসাবে সেবা বস্তিগুলো এবং অন্যান্য স্থানে পুজো, সমাবেশ, ব্যাখ্যান ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানগুলোতে জেলা এবং প্রান্ত স্তরের কার্যকর্তা এবং সাধারণ মানুষ অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে অংশগ্রহণ করেন।

গীতোক্ত জন্মান্তরবাদ ও পুনর্জন্ম

প্রোজ্জ্বল মণ্ডল

সনাতন শাস্ত্রসমূহ আমাদের নিকট কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ণয়ের প্রধান নিয়ামক। যাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ তা পালন কিংবা অনুসরণ ব্যক্তির জন্য মোক্ষ অর্জনের পথে সহায়ক নয়। এরুপ তত্ত্বের উল্লেখ যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় করেছেন—

''যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ। নস সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।।" ২৩

''তস্মাচ্ছাস্তং প্রমাণং তে ক্যাকার্যব্যবস্থিতৌ। জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কম কতুমিহাহসি।।"২৪

(গীতা : ১৬/২৩-২৪)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, তাহার শান্তি-সুখও হয় না, মোক্ষলাভও হয় না। অতএব কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ, সুতরাং তুমি শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা জানিয়া যথাধিকার কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হও।

যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে দ্বিধান্বিত অর্জুনকে যে অমৃত দর্শনের জ্ঞান প্রদান করেছিলেন তা আজ গীতা হিসেবে পরিচিত এবং বহু দার্শনিক থেকে সাধারণ মানুষের নিকট নন্দিত গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভগবদগীতা যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহুবার উল্লেখ করেছেন। সেই স্মৃতি শাস্ত্রে বলা হয়েছে, প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে মৃত্যু একটি চিরন্তন সত্য। কিন্তু জীবাত্মা কখনো বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। এরূপ বাক্য শ্রীমদ্ভগবদগীতার যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ২য় অধ্যায়ের সাংখ্যযোগ এর ২০তম শ্লোকে বলেছেন, ''ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।" (গীতা : ২/২০)

অর্থাৎ, আত্মার কখনও জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না, অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁর উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। তিনি জন্মরহিতশাশ্বত, নিত্য এবং পুরাতন হলেও চিরনবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখনও বিনষ্ট হয় না।

সেজন্য জীবাত্মা শুধু পুরাতন জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ গ্রহণ করে। এরুপ বাক্য শ্রীমদ্ভগবদগীতার ২য় অধ্যায়ের সাংখ্যযোগ এর ২২তম শ্লোকে উল্লেখ রয়েছে—

''বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্য- ন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।" (গীতা : ২/২২)

অর্থাৎ, মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, দেহীও তেমনই দেহত্যাগ করে নতুন দেহধারণ করে।

এই নশ্বর দেহের যেমন সৃষ্টি হয়েছে তেমনি প্রকৃতি নিয়ম অনুসারে জীবাত্মা এই দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহে প্রবেশ করবে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ২য় অধ্যায়ের ২৭তম শ্লোকের যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

''জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।

তস্মাদপরিহার্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।।"

(গীতা : ২/২৭)

অর্থাৎ, যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্মও অবশ্যম্ভাবী। অতএব অপরিহার্য কর্তব্য সম্পাদন করার সময় তোমার শোক করা উচিত নয়।

যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার পুনর্জন্মের উল্লেখ করেছেন গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের (জ্ঞানযোগ) ৫ম শ্লোকে।

''বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।

তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।"

(গীতা : ৪/৫)

অর্থাৎ, হে পরন্তপ অর্জুন! আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সেই সমস্ত জন্মের কথা স্বরণ করতে পারি, কিন্তু তুমি পারো না।

জীবাত্মা অনাদি, তাহার না সৃষ্টি হয়েছে না কখনো ধ্বংস হবে। সকাম কর্মজনিত মোহের কারণে সে সকল কর্মের ফল ভোগের জন্য জীবাত্মা বারংবার এই জড় জগতে ফিরে আসে। যখন সে কর্ম ফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় তখন তাহার কাঙ্ক্ষিত মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে আমরা সকলে উপলব্ধি করতে পারি কর্মফল, অনাদি তত্ত্বের মতো জন্মান্তরবাদ

সনাতন ধর্ম শাস্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ইহা শাস্ত্র সম্মত। তাই কোন অপপ্রচারকারী যদি এরূপ প্রলাপ করে থাকে যে সনাতন ধর্ম শাস্ত্রে জন্মান্তরবাদ এর ধারণা নেই, তাহলে ইহা তাহার অজ্ঞতা কিংবা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

''কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।।''

(গীতা : ২/৪৭)

অর্থাৎ, কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে তোমার কোন অধিকার নেই। কর্মফল যেন তোমার কর্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয়, কর্ম ত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

আমরা যেরূপ কর্ম করব সেরূপ ফল প্রাপ্ত হব। কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখি বহু ব্যক্তি সারাজীবন খারাপ কর্ম করেও কেউ ধনী এবং সে ক্ষমতাশালী হয়ে দিন নির্বাহ করছে। তাহলে সে পাপী বা অন্যায়কারী কি রেহাই পেয়ে যাবেন? অবশ্যই না! অন্যায়কারীর কর্মের ফল তার দিকে পুনরায় ফিরে আসে। এজন্য পবিত্র বেদ এ বলা হয়েছে—

''ইস্বা ঋজীয়ঃ পততু দ্যাবাপৃথিবী তং প্রতি।সা তং মৃগমিব গৃহ্নাতু কৃত্যা কৃত্যাকৃতং পুনঃ।।''

(অথর্ববেদ : ৫/১৪/১২)

অর্থাৎ, দ্যুলোক ও পৃথিবীলোকে দুষ্টকর্ম ফল হয়ে ফেরত আসে কর্তার দিকে যেমন উপরে ছোঁড়া ধনুক নিচের দিকে দ্রুত তেড়ে আসে, যেমনটা আসে বাঘ হরিণের দিকে।

উপরোক্ত মন্ত্র থেকে ইহা বোধগম্য যে, মনুষ্যের কর্মের ফল সে অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। কিন্তু এটা বহুবারই দৃষ্টিগোচর হয় যে অপরাধী অপরাধ কিংবা পাপী পাপে প্রবৃত্ত হয়েও সে অনায়াসে পার পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি এরূপ হলে অনাচার, অবিচার এবং পক্ষপাত আচরণ দৃষ্ট হয়। এরূপ কি কখনো হতে পারে? না! পারে না। এ সংশয়ের সমাধান হল পুনর্জন্ম। অর্থাৎ, ব্যক্তি তার স্বীয় কর্মের ফল ভোগ করার জন্য পরবর্তী জন্মে তা ভোগ করবে ইহাই সত্য। ■

সেবা বৈঠক, মদনপুর, মধ্যবঙ্গ

রাম সীতা সেবা মন্দির পাঁচথুপিতে আশ্রম কমিটির বৈঠক, মধ্যবঙ্গ

সামাজিক সমরসতা কার্যক্রম, উত্তর বীরভূম জেলা, মধ্যবঙ্গ

ভারতমাতা পূজন দিবস উদযাপন, বরাহনগর, দক্ষিণবঙ্গ

সমগ্র ক্রান্তির অগ্রদূত : স্বামী দয়ানন্দ

পারমিতা পাল

১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারি ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের দশমী তিথিতে গুজরাটের মোরবী শহরে অম্বাশঙ্কর তিওয়ারীর গৃহে এক বালক জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর নাম রাখা হয় মূলশঙ্কর তিওয়ারী। আর্থিকভাবে সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারের জন্ম নেওয়ার কারণে ওই বালক অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন। ভগবান শিবের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। কিন্তু একদিন শিব মূর্তির উপর ইঁদুরকে মল-মূত্র ত্যাগ করতে দেখে, তাঁর মনে মূর্তিপূজার প্রতি বৈরাগ্য এসে যায়। তিনি মাত্র ২১ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্বামী বিরোজানন্দজির কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁর নতুন নাম হয় স্বামী দয়ানন্দজি। তখন তাঁর গুরুর বয়স ছিল ৬৭ বছর। আবার বিরোজানন্দজির গুরু স্বামী পূর্ণানন্দজির বয়স ছিল ৯৮ বছর এবং স্বামী পূর্ণানন্দজির গুরু স্বামী আত্মানন্দজীর বয়স ছিল ১৪৮ বছর। জানা দরকার এই ৪ জন সন্ন্যাসী ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের আন্দোলনের সময় পদ্মফুল এবং রুটি বিতরণের ব্যবস্থার দ্বারা সমগ্র আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছিলেন। স্বামী দয়ানন্দজির কাছ থেকে প্রেরণা নিয়েই তাঁতিয়া টোপে, নানা সাহেব পেশওয়া, রানী লক্ষ্মীবাঈ, বালা সাহেব ইত্যাদি সকলে ভারত মায়ের স্বাধীনতার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন এবং বলিদান দেন।

১৮৫৫ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে স্বামী দয়ানন্দজি মাউন্ট আবু থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত পদযাত্রা করেন এবং ক্রান্তির বার্তা দিতে শুরু করেন। স্বামীজি এই কাজের জন্য সর্বপ্রথম সাধু-সন্ন্যাসীদের যুক্ত করার প্রয়াসও করেন, কারণ তিনি জানতেন সাধু-সন্ন্যাসীদের অনেক অনুরাগী বা শিষ্য থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের সেবা এবং সুরক্ষা হেতু অনেক সেবাদার থাকে। সুতরাং যদি ওঁনারা তাঁদেরকে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার আদেশ দেন তাহলে নিশ্চয়ই শুভ পরিণাম হবে। বাস্তবে ৭৫ হাজার যুবকদের একটি স্বয়ংসেবী সেনাবাহিনী তৈরি করতে সমর্থ হন এই প্রয়াসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের যোজনা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি ইংরেজদের আইন ব্যবস্থার নামে প্রহসন এবং মেকলের গুরুকুল ধ্বংস করে ইংরেজি শিক্ষার পরিণাম সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার কাজে মনোনিয়োগ করেন। স্বামীজি ইংরেজদের ন্যায়পালিকা অর্থাৎ আদালতকে বহিষ্কার করার প্রেরণা দিতেন এবং বলতেন ইংরেজরা ন্যায়শীল নয়। তারা ভারতবাসীর অধিকারকে দমন করার জন্যই মিথ্যা ন্যায়ালয় চালান। অত্যাচারী এবং অন্যায় প্রিয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে ন্যায় পাবার আশা বৃথা। ইংরেজদের দমনকারী আইন অত্যাচার করতে পারে, কিন্তু ন্যায় দিতে পারে না। স্বামীজি তাঁর গুরুর কাছে চার বেদের এবং ব্যাকরণের জ্ঞানপ্রাপ্ত করেন এবং দয়ানন্দ সরস্বতী উপাধি লাভ করেন। তিনি বেদ এবং প্রকৃতিকে সর্বোপরি মান্য করে তার প্রচার প্রসারে মন, কর্ম ও বচনকে নিযুক্ত করেন। শিক্ষার শেষে গুরু বিরোজানন্দজি গুরুদক্ষিণা হিসেবে স্বামীজিকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন, যে তিনি আজীবন মানুষের অজ্ঞান ও অখণ্ডতার অন্ধকারকে দূর করার জন্য ব্রতী হবেন। এই ভাবেই স্বামী দয়ানন্দজি জীবনে বেদভক্তি, দেশভক্তি ও ঈশ্বরভক্তির ত্রিবেণী সঞ্চার হয়েছিল। তিনি ইংরেজদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিকার করার জন্য গুরুকুল ব্যবস্থা দৃঢ় করার প্রয়াস পুনরায় চালু করেন।

স্বামী দয়ানন্দজি নিজেকে নিজের বিকল্পহীন সংকল্পের প্রতি সমর্পিত করে দিলেন। তাঁর সংকল্প সিদ্ধির সাধনার জন্য বিভিন্ন ধর্ম, পন্থাও সম্প্রদায়ের গ্রন্থ অধ্যায়ন করলেন। সমস্ত বিদ্যা অর্জন করে সত্য-সার বের করে সত্যার্থ প্রকাশ নামক অমর গ্রন্থ লিখলেন। তাঁর এই অমৃত মন্থনরূপী সত্যার্থ প্রকাশের ফলে মুসলিম সমাজ, খ্রিস্টান সমাজ এমনকি কিছু কিছু সনাতনী অন্ধবিশ্বাসীরা স্বামীজির শত্রু হয়ে উঠল। কিন্তু স্বামীজি ঋষি-মুনিদের বেদ জ্ঞানকে সংসারের সব থেকে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলে স্থাপিত করেন। স্বামীজি বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথার প্রবল বিরোধী ছিলেন এবং তিনি বলতেন সতীদাহ প্রথাকে নারী জাতির উপর পুরুষ সমাজের ভয়ংকর অপরাধ বলে ভাবা উচিত। সতীদাহ প্রথা একটি অমানবীয় প্রথা, তাই এটি সমাপ্ত করা দরকার এবং বিধবাদের সঙ্গে সম্মানপূর্বক ব্যবহার করা দরকার। তিনি বিধবা বিবাহ করানোর পক্ষপাতি ছিলেন। স্বামীজি সম্পূর্ণ মানব জীবন এক দেবতা, এক দেশ, এক ভাষা, এক ভূষার প্রচারক ছিলেন। তিনি অস্পৃশ্যতা,

সাম্প্রদায়িক আধারে মত-মতান্তরে জাতি প্রথার বিরোধী ছিলেন। এইসব প্রথাকে সামাজিক, জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির বাধক বলে মানতেন। তিনি বেদকে এক ধর্মগ্রন্থ, বৈদিক সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ মানব জাতির রীতিনীতি ব্যবহারের একরূপতার জন্য প্রচার করতেন। স্বামীজি শাস্ত্র এবং শস্ত্র এই দুটিরই উপাসক ছিলেন। তিনি দুষ্টুদের জন্য দুষ্ট দমন নীতি প্রয়োগের পক্ষধর ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের বর্ণ ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ সকলের সামনে তুলে ধরে বলতেন, জন্মসূত্রে কোন জাতি নির্ধারণ হয় না, কর্মসূত্রে নির্ধারণ হয়। তিনি জাতি ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু বর্ণ ব্যবস্থার পোষক ছিলেন। স্বামী দয়ানন্দজির এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে ড. আম্বেদকর সম্মান করতেন এবং বলেছিলেন মনুস্মৃতিতে এক বিশেষ বর্গের মানুষ দ্বারা এমন অনেক শ্লোক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যা অবৈজ্ঞানিক এবং বেদবিরুদ্ধ। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সমাজের বিশেষ জাতি এবং নারীজাতির উপর অত্যাচার করার জন্যই ঢোকানো হয়েছে। স্বামীজি সবসময়ই নারী শক্তির সমর্থন করতেন। উনি নারীদের বেদ পড়ার অধিকার দিয়ে বলতেন, তবেই তো গার্গী,মৈত্রেয়ীদের মতো বিদুষীরা সমাজকে মার্গদর্শন দিয়েছিলেন।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের চৈত্র নবরাত্রির দিবসে মুম্বাই শহরে আর্য সমাজের স্থাপনা করেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহারাজ। লাহোরে আর্য সমাজের নিয়মাবলী ঘোষণা করা হয়। আর্য সমাজ বৈদিক ধর্মের প্রচার প্রসারকে নিজেদের লক্ষ্য বলে স্থির করে। এছাড়া দেশের মধ্যে কাল ও পরিস্থিতির কারণে উৎপত্র অহিংসাবাদী কাপুরুষতাকে নিবারণ করার কাজ শুরু করা হয়। বীর বালক হকিকত রায়ের মতো অনেক ক্রান্তিকারী ধর্মবীরদের খুঁজে বের করে ওদের সত্যকার ইতিহাস জনসমক্ষে তুলে এনে বীরত্বের ভাব জাগ্রত করা। স্বামী দয়ানন্দের আদর্শের প্রভাব ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর বিশেষভাবে পড়েছিল। শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মা, রাসবিহারী বোস, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, বীর সাভারকর, লালা হরদয়ালজি এবং ভাই পরমানন্দজি ইত্যাদির মতন অনেক বিপ্লবীরা স্বামীজির সত্যার্থ প্রকাশের হিন্দু স্বরাজ শব্দ থেকে প্রেরণা নিয়ে ভারতমাতাকে স্বাধীন করানোর যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। গুরুকুল কাংগড়ীকে ইংরেজরা বিপ্লবীদের ফ্যাক্টরি বলে চিহ্নিত করেছিল। ইসলাম এবং খ্রিস্টানদের ধর্মান্তকরণের কাজকে স্বামীজি অনেক জায়গায় বাধা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বৈদিক প্রচারের জন্য স্বামীজি দেশের বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য রাখতেন গুজরাটি ভাষাতে। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন ওঁনাকে হিন্দিতে বক্তব্য রাখার আগ্রহ করেন এবং সত্যার্থ প্রকাশ হিন্দি ভাষাতে অনুবাদ করার জন্য বলেন। স্বামীজিও তা মেনে নেয়। স্বামীজি পাখণ্ড, অন্ধবিশ্বাস ও সমাজের কু-রীতিকে শোধরানোর জন্য অনেক প্রয়াস করেন। এইসব কারণে অনেক অজ্ঞাত শত্রুরা স্বামীজিকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। রাজস্থানের যোধপুরের মহারাজা যশবন্ত সিং স্বামীজির সান্নিধ্যে আসেন এবং তার প্রভাবে এক সুন্দরী পতিতার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ওই পতিতা রাধুনীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে দুধে বিষ মিশিয়ে স্বামীজিকে খাইয়ে দেয়। এর ফলে ৩০শে অক্টোবর ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে দীপাবলির দিন স্বামীজি পরলোক গমন করেন।

স্বামী দায়ানন্দ সরস্বতী কেবলমাত্র ধর্ম সুধারক এবং সমাজ সুধারকই ছিলেন না, তিনি নিষ্ঠাবান রাষ্ট্রবাদীও ছিলেন। বালগঙ্গাধর তিলক বলেছিলেন, স্বরাজের মন্ত্র সর্বপ্রথম স্বামী দয়ানন্দই দিয়েছিলেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতার ভিত্তিপ্রস্তর বাস্তবে স্বামী দয়ানন্দজি রেখেছিলেন। ডঃ ভগবান দাস বলেছিলেন, স্বামী দয়ানন্দ হিন্দু পুনঃজাগরণের মুখ্য নির্মাতা ছিলেন। শ্রীমতি অ্যানি বেসান্ত বলেছিলেন, স্বামী দয়ানন্দ ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি আর্যাবর্তকে আর্যব্রতীদের জন্যই বলেছিলেন। ফ্রেঞ্চ লেখক রোমা রোলার মতে, স্বামী দয়ানন্দ রাষ্ট্রীয় ভাবনা এবং জনজাগৃতিকে ক্রিয়াত্মক রূপ দেওয়ার জন্য প্রয়াসী ছিলেন। বাস্তবে উদারচেতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীজি আর্য সনাতন বৈদিক সংস্কৃতির জাজ্বল্যমান জ্যোতিপুঞ্জ এবং সমগ্র ক্রান্তির অগ্রদূত ছিলেন। ■

সন্ত রবিদাস জয়ন্তী পালন, পাইকপাড়া, দক্ষিণবঙ্গ

সন্ত রবিদাস জয়ন্তী : মাঘ পূর্ণিমা

বিনায়ক দেশপাণ্ডে

সন্ত রবিদাস একজন মহান সন্ত ছিলেন। তিনি কাশীতে থাকতেন এবং পুরমানন্দচার্য মহারাজের শিষ্য ছিলেন। সন্ত রবিদাস যুক্তি দিয়েছিলেন যে বর্ণ বৈষম্য মিথ্যা। জন্ম একজনকে অন্যের থেকে আলাদা করে না; একজনের কর্মই একজনকে মহান করে তোলে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সকলকে উন্নত করবে, বর্ণ নির্বিশেষে। সন্ত রবিদাস একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী সন্ত ছিলেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য তিনি অসংখ্য চাপের সম্মুখীন হয়েছিলেন, ভয় পেয়েছিলেন যে তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহলে তাঁর হাজার হাজার অনুসারীও ইসলাম গ্রহণ করবেন। সদনা পীর তাকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করতে এসেছিলেন। দুজনের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়। সদনা পীর রবিদাসজির সামনে নির্বাক হয়ে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেন। তিনি রবিদাসজির ভক্তি এবং আধ্যাত্মিক সাধনায়ও মুগ্ধ হয়ে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি সন্ত রবিদাসজির শিষ্য হয়ে রামদাস নাম ধারণ করেন।

আরও মুসলিম হিন্দু হয়ে ওঠেন। সিকান্দারলোদি তখন সুলতান ছিলেন। ধর্মগুরুরা তাঁর কাছে অভিযোগ করেন। সুলতান রবিদাসজিকে বন্দী করেন। তিনি তাঁকে মুসলিম হওয়ার জন্য চাপ দেন, নির্যাতন করেন এবং এমনকি প্রলোভনও দেন। সন্ত রবিদাস দমে যাননি। তিনি দৃঢ়ভাবে হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর বিশ্বাস এবং ভক্তি প্রকাশ করেছিলেন, ‘‘আমার বিরুদ্ধে ছুরি ব্যবহার করা হলেও আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করব না।’’ হুমকি দেওয়া হলে তিনি বলেছিলেন, ‘‘আমি আমার জীবন ত্যাগ করব কিন্তু আমার ধর্ম নয়।’’ কিন্তু পরে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে এবং সিকান্দারলোদি ক্ষমা চেয়ে রবিদাসজিকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন।

তাঁর ভক্তি দেখে কাশীর রাজা তাঁর শিষ্য হন। চিত্তোরের রানী ঝালি বৈসা এবং পরিবারের পুত্রবধূ, সন্ত মীরাজি তাঁর শিষ্য হন। সন্ত রবিদাসজি-এর সমাধি চিত্তোরে অবস্থিত। চিত্তোরের মহারাণা রবিদাসজিকে মন্দিরে অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। রাজা রবিদাসজিকে সম্মান জানান।

সন্ত রবিদাসজি ছিলেন চানওয়ার বংশের একজন ক্ষত্রিয় এবং পিপাল বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সন্ত রবিদাসজি তাঁর স্তোত্রে বলেছেন, ‘‘যার পরিবার আজ বারাণসীতে মৃত পশু বহন করে। হে রাইদাসদাশানুদাসের পুত্র, ব্রাহ্মণরা যথাযথ রীতিনীতি অনুসারে তাকে প্রণাম করে।’’ অর্থ, রবিদাসজি-এর বর্ণের ভাইয়েরা আজ বারাণসীতে মৃত পশু বহন করে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন সম্মানিত মানুষ, যাদের কাছে ব্রাহ্মণরা প্রণাম জানাতেন।

আমাদের সকলের মনে রাখা উচিত যে ইসলামিক আগ্রাসনের পরে ভারতে অস্পৃশ্যতা এসেছিল। প্রাচীনকালে, আমাদের ঋষি-সন্তরা হরিণের চামড়া এবং বাঘের চামড়া পরতেন। বনে মৃত হরিণ বা সিংহ পেলে তারা এবং তাদের শিষ্যরা চামড়া তুলে পরিষ্কার করতেন। কিন্তু আমরা এই ঋষি-সন্তদের চামড়ার মালিক বলিনি।

আমরা সুতি ও রেশমের পোশাক পরতাম এবং রপ্তানি করতাম। দড়ি ও সুতো তুলা বা রেশম দিয়ে তৈরি হত। চামড়ার জুতা ছিল না; কাঠের চপ্পল ব্যবহার করা হত। তবে, আরবে সুতি বা রেশমের অভাব ছিল। চামড়ার জুতা, চামড়ার ব্যাগ, চামড়ারদড়ি এবং চামড়ার জিন ছিল। সবাই মাংস ভক্ষণকারী ছিল। তারা ভারতে এসে ভারতে এই প্রথাগুলো চালু করে। চামড়ার চাহিদা শতগুণ বৃদ্ধি পায়। মাংসের ব্যবহারও শতগুণ বৃদ্ধি পায়। লক্ষ লক্ষ গরু, ষাঁড় এবং অন্যান্য প্রাণী জবাই করা শুরু হয়। গরুর মাংস ভক্ষণকারী মুসলিম আক্রমণকারী রাজোর পূর্বক হিন্দু বন্দীদের নিয়োগ করত, পরাজিত এবং দাসত্ব করত এই কাজের জন্য (ট্যানিং, জুতা, চপ্পল, ঢাল এবং অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈরি)। চামড়া দিয়ে কাজ করা এই হিন্দু বন্দিরা ট্যানার হয়ে ধীরে ধীরে অস্পৃশ্য হয়ে ওঠে। যাদের পশু জবাই করতে হত তারা হিন্দু খটিক হয়ে যায় এবং অস্পৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু তারা সবাই তাদের হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেনি, তারা সকলেই ধর্মের যোদ্ধা।

● ইসলামের আবির্ভাবের আগে ভারতের সকল

তফসিলি জাতি উচ্চবর্ণের ছিল। আমরা সকলেই একই বংশের।

● শ্রী অশোকজি বলেছিলেন যে তফসিলি জাতি ও উপজাতিরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী। এই জাতিগুলো ধর্ম ও দেশের জন্য লড়াই করেছিল। তারা অস্পৃশ্যতা মেনে নিয়েছিল কিন্তু তাদের ধর্ম পরিবর্তন করেনি। সেই সময়ে যদি এই সমস্ত জাতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত তাহলে ভারতের কী হত? এই সমস্ত জাতি সকলের প্রতি মহান অনুগ্রহ করেছে। ধর্ম রক্ষার জন্য সকলেরই তাদের সম্মান করা উচিত। তারা সকলেই ধর্মের যোদ্ধা।

● ভিএইচপি এই ধারণাটি প্রচার করে : সামাজিক সম্প্রীতি বিরাজ করতে হবে, এবং সকল বৈষম্য ও বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হবে।

● ২০০৫ সালে, চিতোর থেকে বারাণসী পর্যন্ত বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দ্বারা ১৫ দিনের দীর্ঘ 'সন্ত রবিদাস চেতনা যাত্রা' সংগঠিত হয়েছিল। ■

উত্তর বীরভূম জেলায় সন্ত রবিদাস জয়ন্তী পালন

উত্তর বীরভূম জেলায় হয়ে গেল সন্ত রবিদাস জয়ন্তী পালন বামদেব প্রখণ্ডের খরুন খণ্ডের চাকপাড়া গ্রামে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্রীয় সম্পাদক মাননীয় অমিয়কুমার সরকার মহাশয়, মধ্যবঙ্গ প্রান্তের কার্যকরী সভাপতি মাননীয় অরিণকুমার মণ্ডল মহাশয়, এছাড়া জেলা কার্যকর্তাগণ। অনুষ্ঠান শুরু হয় নগর পরিক্রমা হরিনাম সংকীর্তন এর মাধ্যমে। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন মাননীয় অমিয়কুমার সরকার। রবিদাস জয়ন্তীর সম্পাদক অনিল দাস, সভাপতি চৈতন্য দাস, কোষাধ্যক্ষ অনিল দাস ও বনবাসী রক্ষা পরিবার ফাউণ্ডেশনের সদস্য ও বামদেব খণ্ডের সভাপতি মাননীয় অসীমকুমার মজুমদার। সভা শুরুতে বক্তব্য রাখেন মাননীয় ক্ষেত্রীর সম্পাদক। এরপর বাচ্চাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রত্যেককে উপহারস্বরূপ একটি করে ডায়েরি উপহার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংখ্যা ছিল ৩২২ জন। শেষে সহভোজন সামাজিক সমরসতা বজায় রেখে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রদের একসাথে বসিয়ে ভজন মন্ত্র সহকারে পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল চামার পাড়ার নাম পরিবর্তন করে বাল্মীকি পাড়া করা হয় সকলের সম্মতিতে। জয় শ্রীরাম, ভারত মাতা কি জয়।

শোক সংবাদ

সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক এবং আমাদের সকলের প্রিয় রঞ্জনদা (রঞ্জনকান্তি ভূঁইঞা) কেশব ভবনে গত ১৯শে জানুয়ারি সকাল ৬.৩০ মিনিটে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে ওনার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। স্বর্গীয় রঞ্জনদার জন্ম মেদিনীপুর জেলার মাধপুর খণ্ডের যকপুরে। গত ১৯৮১ সাল থেকে প্রচারক জীবন গ্রহণ করেন। গত কয়েক বছর থেকে ওনার কেন্দ্র কলকাতা কেশব ভবন ছিল। অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও সকলের সাথে নিত্য আলাপচারিতা চোখে পড়ার মতো ছিল। ওম শান্তি। ওম শান্তি।

শীতবস্ত্র বিতরণ, মেদিনীপুর জেলা, দক্ষিণবঙ্গ

শীতবস্ত্র বিতরণ, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণবঙ্গ

হিন্দু জীবনে মন্দির-মঠ ও অর্চক পুরোহিতের ভূমিকা

দিলীপ কুমার ঝাঁওর

গত সংখ্যার পর....

মন্দির পঞ্চ প্রকল্প দ্বারা হিন্দু সমাজের শক্তির কেন্দ্র হতে পারে। পঞ্চ প্রকল্পগুলি—১) সেবা, ২) সংস্কার, ৩) বলোপসনা, ৪) জাগরণ ও ৫) প্রচারকেন্দ্র।

১) মন্দির ধর্মের সেবাকেন্দ্র : 'অতিথি দেবোঃ ভাবোঃ' এইটা হিন্দু সমাজের মনোভাবে আছে। অন্নদান একটি সহজ পদ্ধতি, কিন্তু অন্নদান কোন সেবা হয় না। আমাদের গৃহে কেউ অন্ন গ্রহণ করলে তখন আমরা তাঁকে অতিথির সম্মান দিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

২) স্বাস্থ্য হেতু সেবা প্রকল্প : সমাজের সবার স্বাস্থ্য উত্তম থাকুক, ব্যাধি রোহিত হোক, তার জন্য মন্দির থেকে আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথি এবং এলোপ্যাথি সাপ্তাহিক কিংবা দৈনন্দিন চিকিৎসা আরম্ভ করা উচিত। যার ফলে গরীব মানুষ বিনামূল্যে কিংবা স্বল্প মূল্য চিকিৎসা লাভ করতে পারে। এর ফলে সমাজ সুস্থ থাকলে মন্দিরের সঙ্গে সনাতন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকবে তারা।

৩) শিক্ষা হেতু সেবা প্রকল্প : মন্দির দ্বারা অধ্যয়ন কেন্দ্র, কোচিং ক্লাস ইত্যাদি শুরু করলে ছাত্রদের নিশুল্ক শিক্ষা লাভ হবে। মন্দির ট্রাস্ট দ্বারা শিক্ষাবৃত্তি বা স্কলারশিপ চালু করলে, যুবকদের মনে কৃতজ্ঞতার ভাব জাগ্রত হবে এবং সনাতন ধর্মের প্রতি অনুরাগ বাড়বে।

৪) মন্দির হিন্দু ধর্ম সংস্কার কেন্দ্র : জীবনে সংস্কারের গুরুত্ব আছে। মানুষ সুসংস্কারের ফলে দেবত্ব প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হতে পারবে। যদি সু-সংস্কার না থাকে, তাহলে মানবই দানবে পরিণত হবে। প্রায় সবাই চান যে তার সন্তান সু-সংস্কারিত হোক, কিন্তু তারা সনাতন হিন্দু ধর্মের ষোড়শ সংস্কার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, অজ্ঞাত থাকেন। এই ১৬টি সংস্কার বর্তমান প্রজন্মের জন্য আউট অফ সিলেবাস কোর্সে আছে। মন্দির থেকে এই ষোড়শ সংস্কারের জ্ঞান প্রচার করা দরকার। এইগুলি হল—

জন্মের পূর্বে---১) গর্ভধারণ ২) পুন্সবন ৩) সিমন্তোন্নপন। **জন্মের পশ্চাৎ—**১) জাতকর্ম, ২) নামকরণ ৩) নিষ্ক্রমণ ৪) অন্নপ্রাশন ৫) মুণ্ডন ৬) কর্ণভেদন ৫) যজ্ঞপবিত ৬) বিদ্যারম্ভ ৬) সমাবর্তন ৭) বিবাহ ৮) সর্বসংস্কার ৯) সন্ন্যাস । **মৃত্যুর পরে—**১) অন্ত্যেষ্টি।

৫) মন্দির পরিসরে হিন্দু পঞ্চাঙ্গ : তিথি, বার, নক্ষত্র, পক্ষ, মাস, সংবৎসর এবং দিনের বিশেষ এবং সুবিচার লেখার জন্য একটি ফলক থাকা উচিত, যাতে মন্দির দর্শন হেতু আগত ভক্তদের প্রতিদিনের ভালো বিচার করবার সুযোগ থাকে।

৬) মন্দির পরিসরে দর্শনীয় ভাগ : হিন্দু ধর্মের অমূল্য সম্পদ গ্রন্থগুলি মন্দিরে দর্শন হেতু রাখা উচিত। চারটি বেদ, ছয়টি শাস্ত্র, দশ উপনিষদ, ১৮ পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত গীতা এবং শ্রীরামায়ণ মহাভারতের মতো গ্রন্থগুলি রাখা উচিত। মন্দিরের মাধ্যমে সাপ্তাহিক সংস্কার কেন্দ্র, পূজারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ধার্মিক যাত্রা ব্যবস্থাপনার সংরচনা করা উচিত।

৭) মন্দির হিন্দু ধর্মের বল-উপাসনা কেন্দ্র : মন্দির দ্বারা যুবকদের জন্য আখড়া জিমখানা প্রভৃতি বল-উপাসনার কেন্দ্র স্থাপন করা উচিত। যেখানে যুবকেরা বল সঞ্চয় করার জন্য অভ্যাস করবে। মন্দির দ্বারা নেশা মুক্ত সমাজ, নীতিমান ও ধর্ম রক্ষকদের নির্মাণ করা দরকার।

সমাজের অন্য জিমগুলিতে ডায়েট বা হেলথ ড্রিঙ্কসের নামে স্টেরোয়েড দেওয়া হয়। এর পরিনাম স্বরূপ যুবকদের মধ্যে নপুংসকতা বেড়ে যায় এবং বৌদ্ধিক স্তরের ও স্মরণশক্তির অভাব শুরু হয়ে যায়। এই সব কিছু যুবকদের বোঝানো দরকার।

মন্দির দ্বারা যোগাসন এবং প্রাণায়ামের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা উচিত। হিন্দুদের আহার ও জীবনশৈলী সম্পর্কে সময় সময় জ্ঞান প্রদান করা। ঋতু অনুসারে ভোজন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা দরকার। ফাস্টফুড, পিজ্জা, বার্গার, ম্যাগি ইত্যাদি নিকৃষ্ট সত্যহীন পদার্থ সেবন আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, সেটা বলা দরকার। হিন্দু শাস্ত্রে অন্নকে পূর্ণব্রহ্ম বলা হয়ে থাকে। অন্নের শুদ্ধতা মানুষের বিচারের শুদ্ধতা বজায় রাখে। বিধর্মীরা পরিকল্পনা মাফিক হিন্দু যুবকদের নেশা করতে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করে থাকে। এই বিষয়ে যুবকদের সতর্ক করা দরকার।

৮) মন্দির হিন্দু ধর্মের জাগরণের কেন্দ্র : মন্দিরের অর্চক-পূজারীদের মন্দিরে আগত ভক্তদের সূচি বানিয়ে

ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের মধ্যে ধর্মাচরণ ও ধর্মের প্রতি স্বাভিমান জাগানোর প্রয়াস করা দরকার। ধর্মাচরণ অর্থাৎ ভগবানের দেওয়া উপদেশকে নিজের আচরণের মধ্যে আনা এবং ধর্মশাস্ত্র অনুসারে জীবন যাপন করা। সাধারণ মানুষ ভগবানকে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু ভগবানের জ্ঞান বা পথ নির্দেশকে শ্রদ্ধা পূর্বক জীবনে পালন করেন না। সেই কারণে ভগবান বলেন, 'তুমি সেটাই কর, যেটা তোমার মন চাইছে কিন্তু সফল সেটাই হয়, যা আমি চাইছি। সেই কারণে তুমি সেটাই কর, যা আমি চাইছি। তবেই সেটা হবে, যা তুমি চাইছ।' ভগবান আরও বলেন, 'সৃষ্টিতে সমস্ত প্রাণী যারা জন্ম নেয়, তারা সকলেই আমার অংশ। আমার আদেশই প্রকৃতি এই চরাচরে সৃষ্টির প্রসবণ করে। যেখানে সর্বসাধারণের হিতের অর্থাৎ কল্যাণের সংকল্প নেওয়া হয়, সেখানে আমার আশীর্বাদ থাকে।' কিন্তু আমরা কি সেটাই ভাবি? আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র, আমি ধনবান, আমি গরিব, আমি শ্রেষ্ঠ, আমি কনিষ্ঠ, এই ধরনের ভেদাভেদপূর্ণ ব্যবহার কেন করি? আমি কেন ভেদ-ভাবের কারণে মানুষের সঙ্গে পশুতা পূর্ণ ব্যবহার করি? যদি আমি ঈশ্বরকে প্রমুখ মানি, তবে তার ইচ্ছা অনুসারে সংসার চলছে। তাহলে কেন অহংকার জাগে, যে অমুক কাজ আমার দ্বারা হয়েছে আমি ছাড়া অন্য কেউ কিছু করতে পারবে না। আমাকেই সব করতে হবে, এমন ভাবনা কেন জাগে? আমার দ্বারা যে সমস্ত কাজ হচ্ছে, তা সব ঈশ্বরের কৃপায় হচ্ছে এটি কেন ভাবি না? ঈশ্বর আমাদের অধিনায়ক, তিনি সমস্ত কিছু করিয়ে নিচ্ছেন, এটি কেন ভাবি না? আমাদের ভগবানকে মানবার সঙ্গে সঙ্গে ওঁনার উপদেশকেও মানার দরকার।

৯) ধর্মের প্রতি স্বাভিমান : আজ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নির্মিত সনাতন হিন্দু ধর্ম ছেড়ে আমাদের বন্ধু অন্য ছোট সঙ্কুচিত বিচারে প্রভাবিত হয়ে কেন ইসলাম কিংবা খ্রিস্টিয় ধর্ম গ্রহণ করে নিচ্ছে? এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যে আমরা ধর্মশাস্ত্রের আচরণ না মেনে লোভী, মোহগ্রস্ত হয়ে, হীন ভাবনা গ্রস্ত হয়ে নিজেকেই দুর্বল বোধ করতে থাকি। খ্রিস্টানরা দুস্থদের সেবার আড়ালে ধর্মান্তর করিয়ে দিচ্ছে। ইসলামীরা জোরপূর্বক কিংবা প্রেমের আড়ালে ধর্ম পরিবর্তন করিয়ে দিচ্ছে। সম্ভবত, ভারতবর্ষই এমন একটি দেশ, যেখানে বহু সংখ্যক সমাজ অল্পসংখ্যকদের দ্বারা ভয়ভীত হয়ে, নিজেদের সম্পত্তি বিক্রি করে পলায়ন করে। বাড়ির মহিলারা লাভ জিহাদের শিকার হচ্ছে, গো বংশকে দিনে-দুপুরে হত্যা করা হচ্ছে। এসব কেন হচ্ছে? ভাবলে দেখা যাবে, যে হিন্দু সমাজ মনের মধ্যে ভয় ও লোভকে, স্বার্থকে ত্যাগ করতে পারছে না। ভগবান গীতাতে উত্তম পুরুষের ২৬টি গুণের উপদেশ দিয়েছেন। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অভয় অর্থাৎ যা যে কাউকে ভয় দেখায় না এবং যে কারো দ্বারা ভয় ভীত হয় না। যে ব্যক্তি ভয়গ্রস্থ, সে কখনো ভক্তি করতে পারে না। ভগবান সর্বশক্তিমান, এই বিশ্বাস নড়বড় হলে আসুরী শক্তি আমাদের পরাস্ত করে দেয়। এই কারণে ভগবানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে, শ্রদ্ধাপূর্বক জীবন যাপন করে ধর্মের প্রতি স্বাভিমান জাগিয়ে সত্যিকারের ভক্ত হতে হবে।

মন্দির ভক্ত পরিবার যদি উপরে বর্ণিত উপক্রম প্রারম্ভ করে, তবে একটি সুরক্ষাচক্র নির্মিত হয়, তাহলে ভক্ত পরিবার নেশামুক্ত থাকবে। পরিবারের কোন ব্যক্তি ধর্মান্তরিত হবে না। পরিবারের মহিলারা জিহাদের ষড়যন্ত্রে পড়বে না। ভক্তদের পরিবারের গোবর্ধন, গো-সম্বর্ধন হবে। এই বিশ্বাসগুলি জাগ্রত হলে মন্দির বাস্তব অর্থে সমাজের সুরক্ষা চক্র হবে।

১০) হিন্দু ধর্মের প্রচার কেন্দ্র মন্দির : বর্তমান যুগে প্রচারের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। মন্দির হিন্দু ধর্মের মুখ্য কেন্দ্র, তাই মন্দির থেকেই হিন্দু ধর্মের প্রচার হওয়া উচিত। যেমন—চার্জ থেকে খ্রিস্টানরা এবং মসজিদ থেকে মুসলমানরা তাদের ধর্ম প্রচার করে থাকে। মন্দিরের দিনপঞ্জিকা, ব্রত, উপবাসের মনোবৈজ্ঞানিক ও সামাজিক গুরুত্ব, আরোগ্য দায়ী হিন্দু আহার ও ভোজন, ষোড়শ সংস্কার, জন্মদিন পালন পদ্ধতি, স্বদেশী বেশভূষা, স্বভাষা, স্বভূষার ব্যবহারে গুরুত্ব আদির বিবরণ ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা দরকার। বর্ষ প্রতিপদ হিন্দু নববর্ষের ধ্বজা লাগানোর জন্য উৎসাহ প্রদান করা এবং ঘরে ঘরে প্রসাদ বিতরণ করার জন্য আবেদন করা দরকার। মন্দিরকে সমাজের শক্তিকেন্দ্র বানানোর জন্য মাঝে মাঝে গোষ্ঠী বা সভার আয়োজন করা, যেখানে বিভিন্ন বিষয়, যেমন— মন্দির এবং মানব মনোবিজ্ঞান, মন্দির রোজগার কেন্দ্র, মন্দির আরোগ্য ও মনরোগ কেন্দ্র, মন্দির সেবাকেন্দ্র, মন্দির সংস্কার কেন্দ্র, এই ধরনের ব্যাখ্যামালা করা উচিত যা হিন্দু সমাজকে ধর্মাচরণ এবং ধর্ম স্বাভিমান জাগানোর পথে আগ্রহী করবে।

জেলার প্রখণ্ড সহ মন্দিরের ব্যবস্থা সূচি বানানো দরকার। যেমন—

ক) সংঘ বিচারের কার্যকর্তা দ্বারা পরিচালিত মন্দির

খ) সার্বজনীন ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত মন্দির

গ) নিজস্ব পারিবারিক ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত মন্দির

ঘ) আখড়া এবং মঠ দ্বারা পরিচালিত মন্দির

ঙ) প্রাচীন মন্দির

চ) কোন ট্রাস্ট নেই এমন মন্দির

ছ) সেবা বস্তির মন্দির

জ) সংবেদনশীল এলাকার মন্দির

ঝ) সরকার দ্বারা অধিকৃত মন্দির এই সমস্ত কাজের জন্য প্রান্ত টোলির (১৫ জনের) নির্মাণ করার দরকার। এই প্রান্তটলির কমপক্ষে ত্রৈমাসিক বৈঠক করা দরকার। প্রান্তের মন্দির অর্চক-পুরোহিত প্রমুখ এবং সহ প্রমুখ অবশ্যই থাকা প্রয়োজন।

ঞ) প্রান্তের মন্দির অর্চক পুরোহিত সম্পর্ক প্রমুখ ও সহ প্রমুখ অবশ্যই থাকা দরকার।

১১) প্রান্তের টোলি রচনা : ১) সেবা মুক্ত বিচারপতি, কিংবা মন্দির বিষয় উকিল। ২) লেখাকার। ৩) মহিলা ন্যাসি, মহিলা পূজারী-পুরোহিতদের সম্পর্ক করার জন্য দুইজন বোন (মহিলা)। ৪) মন্দিরের স্থাপত্য, পুরাতত্ত্ব বিভাগের কোন ব্যক্তি। ৫) মন্দির আধারিত রোজগার সৃজনকারী ব্যক্তি। ৬) মন্দির অধ্যায়ন এবং লেখনকারী। ৭) সম্পন্ন এবং সেবা প্রকল্পকারী মন্দিরগুলির সঙ্গে সম্পর্ক কারি ৮) সেবা বস্তিকে সম্পর্ককারি। ৯) সংবেদনশীল এলাকায় এবং সমস্যাগ্রস্ত মন্দিরের সঙ্গে সম্পর্ককারী। ১০) মাসিক প্রচার-প্রসার পত্রিকা ও মন্দিরের প্রচার প্রসার পত্রিকা দেখাবার জন্য একজন। ১১) সমাজের প্রবধান হেতু ব্যাখ্যানমালা প্রমুখ। এই সমস্ত কার্যকর্তাদের সংগঠনের বৈঠকে উপস্থিত থাকা উচিত এবং সংগঠনের বার্ষিক কার্যক্রমগুলির সহযোগিতায় অবশ্যই থাকা দরকার। প্রান্তের অর্চক- পুরোহিত বিভাগের প্রতিবছর দ্বি-দিবসীয় প্রান্ত বৈঠক করা দরকার। সেখানে বিভাগ ও জেলা স্তরের অর্চক-পুরোহিত সম্পর্ক প্রমুখে উপস্থিত থাকবেন।

১২) অভ্যাস বর্গ : বিভাগ অনুসারে জেলা টলি এবং প্রখণ্ড স্তরের অর্চক-পুরোহিতরা দুই দিবসীয় বর্গ করবেন।

১৩) জেলা স্তরে মন্দির ন্যাসি সম্মেলন : সব মন্দিরের ব্যবস্থাপক এবং ট্রাস্টিদের মধ্যে সমন্বয় এবং সংবাদ আদান প্রদানের জন্য জেলা স্তরে মন্দির সম্মেলন করা দরকার। কমপক্ষে জেলার প্রখণ্ড স্তরে ১০০টি মন্দিরের ব্যবস্থাপক ও প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত হোক এরূপ প্রয়াস করা দরকার। সম্মেলনে উপস্থিতদের নাম সূচিবদ্ধ করা দরকার এবং সকলের ভোজন ব্যবস্থা থাকা উচিত। ছোট খাটো মন্দিরগুলির জন্য অভিভাবক মন্দির যোজনা তৈরি করার দরকার, যাতে তাদের কিছুদিনের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া যায়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মন্দির এবং অর্চক-পুরোহিত বিভাগের গুরুত্ব সমাজ জীবনে অপরিসীম। সুস্থ ও সবল সমাজ গড়বার কাজে মঠ ও মন্দির অর্চক-পুরোহিতদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভেবে কার্যকর্তাদের অগ্রসর হওয়া দরকার। ■

শোক সংবাদ

ব্রহ্মপুর জেলা সমিতির অর্চক পৌরহিত্য প্রমুখ শ্রীযুক্ত স্বপন রায় মহাশয়ের মাতা বেলারানী একশত বৎসর বয়সে স্বজ্ঞানে নিজ বাসভবনে গত ৩রা জানুয়ারি শনিবার বেলা ১১/৪৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র, এক পুত্রবধূ ও এক নাতি সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ আত্মীয় পরিজন রেখে যান। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তাঁর আত্মার পরম গতি প্রার্থনা করে এবং উনার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

....

গত ১লা জানুয়ারি ২০২৬ সকাল ৭টায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন সহ সভাপতি সুশীল ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৮৪ বৎসর বয়সে বার্ধক্য জনিত কারণে স্বজ্ঞানে নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্র, দুই পুত্রবধূ, এক কন্যা, জামাতা, তিন নাতনি, এক নাতি সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধকর বন্ধু বান্ধব রেখে যান। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে উনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করা হয়েছে এবং উনার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

বাংলার হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দুধর্মের বৈশ্বিক প্রাসঙ্গিকতা এক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণ

বরিষণ চট্টোপাধ্যায়

বাংলা, ভারতের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিরস্থায়ী। ১৯ শতকের শেষভাগ থেকে ২০ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত, বাংলা ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক জাগরণের কেন্দ্র। একই সঙ্গে এটি হিন্দু জাতীয়তাবাদের আন্দোলনের জন্মভূমি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ঋষি অরবিন্দের মতো চিন্তাবিদরা এই আন্দোলনের প্রধান পথপ্রদর্শক ছিলেন। তাঁদের চিন্তাধারা শুধু জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করেনি, বরং ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতি গর্ববোধ করতে শিখিয়েছিল।

বাংলা : হিন্দু জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রবিন্দু

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' এবং 'বন্দেমাতরম' গানটি বাংলার হিন্দু জাতীয়তাবাদের ভিত্তি স্থাপন করে। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনিকে কেন্দ্র করে রচিত, যেখানে ভারতমাতার মুক্তির জন্য আত্মত্যাগের এক মহাকাব্যিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই উপন্যাসের অন্তর্গত 'বন্দেমাতরম' গানটি ভারতীয়দের হৃদয়ে দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলে। এটি পরবর্তীতে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু জাতীয়তাবাদকে এক আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রদান করেন। তাঁর মতে, ভারতের মুক্তি তার নিজস্ব ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত। তিনি ভারতীয়দের তাদের সনাতন ধর্মের প্রতি গর্ববোধ করতে শেখান এবং বলেন, ''উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত''—ওঠো, জাগো, এবং নিজের সত্ত্বা উপলব্ধি করো। তাঁর চিন্তাধারা ভারতীয়দের আত্মবিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক শক্তি জাগিয়ে তুলেছিল।

ঋষি অরবিন্দ এই আন্দোলনকে আরও বিপ্লবী মাত্রা প্রদান করেন। তাঁর মতে, ভারতের স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক মুক্তি নয়, বরং তা একটি আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ। তিনি কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগের মাধ্যমে ভারতীয়দের তাদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক পথে অগ্রসর হতে উৎসাহিত করেন। বাংলা সেই সময়ে রেনেসাঁর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে, যেখানে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং সুভাষচন্দ্র বসুর মতো মনীষীরা ভারতের সাংস্কৃতিক এবং বৌদ্ধিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

হিন্দুধর্মের বৈশ্বিক প্রাসঙ্গিকতা

বাংলার হিন্দু জাতীয়তাবাদের এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি, হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলো তাকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ বৈশ্বিক ধর্মীয় ব্যবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। এর বহুত্ববাদী শিকড় এবং দার্শনিক নমনীয়তা বিভিন্ন মতবাদ এবং পথের সহাবস্থানকে স্বীকৃতি দেয়। হিন্দুধর্মের কোনও একক প্রতিষ্ঠাতা বা নির্দিষ্ট মতবাদ নেই, যা তাকে সময়ের সাথে অভিযোজিত হতে সাহায্য করে। এর শাস্ত্রীয় সংগ্রহ, যেমন—বেদ, উপনিষদ এবং পুরাণ, প্রাচীন ঐতিহ্যকে নতুন প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে তোলে।

হিন্দুধর্মের নৈতিক কাঠামো, বিশেষত ধর্ম এবং কর্মের নীতি, ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং সামাজিক সম্প্রীতির উপর জোর দেয়। ধর্ম (ধার্মিক কর্তব্য) ব্যক্তিদের তাদের ভূমিকা অনুযায়ী কাজ করতে উৎসাহিত করে এবং অহিংসা, সত্য এবং করুণার মতো সর্বজনীন মূল্যবোধ বজায় রাখে। কর্ম এবং পুনর্জন্মের ধারণা জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নৈতিক দায়িত্বের গুরুত্বকে তুলে ধরে।

প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং পরিবেশের সাথে সংযোগ হিন্দুধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। অনেক দেবতা প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে, যা পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধি করে। পবিত্র বনভূমি এবং উৎসবের মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ছন্দ মেলানোর প্রচেষ্টা দেখা যায়। গঙ্গার প্রতি শ্রদ্ধা, গো-রক্ষার মতো আচার-অনুষ্ঠান পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতার শিক্ষা দেয়।

অন্তর্ভুক্তি এবং সংলাপের শক্তি

হিন্দুধর্মের বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্তর্ভুক্তির নীতিগুলো

বৈশ্বিক সংলাপের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করে।

'একম সৎ, বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—সত্য এক, ঋষিরা একে বিভিন্ন নামে ডাকেন—এই উক্তি হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত সহনশীলতা এবং গ্রহণযোগ্যতাকে প্রতিফলিত করে। ঐতিহাসিকভাবে, হিন্দু সমাজ ইহুদি, পার্সি, খ্রিস্টান এবং মুসলিমদের আতিথ্য দিয়েছে, যা সহাবস্থানের একটি মডেল প্রদান করেছে।

হিন্দুধর্মের ধ্যান, যোগ এবং বেদান্ত দর্শন বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানকারীদের আকর্ষণ করে। এটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বদৃষ্টির পরিপূরক হিসেবে অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং আত্ম-উন্নতির সরঞ্জাম সরবরাহ করে।

চ্যালেজ এবং সম্ভাবনা

তবে, হিন্দুধর্মের এই বহুত্ববাদী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকৃতির মধ্যেও কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। যেমন— জাতপাতের ব্যবস্থা এবং তার অপব্যবহার সমতার আদর্শের বিরোধিতা করে। মধ্যযুগীয় আক্রমণ এবং বিভাজনের সহিংসতার মতো ঘটনা দেখায় যে রাজনীতিকরণের সময় ধর্মকে বিভাজনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে, সংস্কার আন্দোলন, যেমন আর্য সমাজ এবং দলিত সক্রিয়তা, হিন্দুধর্মকে আরও গতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে সাহায্য করেছে।

উপসংহার

বাংলার হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দুধর্মের বৈশ্বিক প্রাসঙ্গিকতা একে অপরের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। বাংলার হিন্দু জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক আন্দোলন ভারতীয়দের তাদের সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতি গর্ববোধ করতে শিখিয়েছিল। অন্যদিকে, হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলো একটি শান্তিপূর্ণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্ব গড়তে সাহায্য করতে পারে। যখন এর সম্প্রীতি, অহিংসা এবং বহুত্ববাদ নীতিগুলো সমুন্নত রাখা হয়, তখন এটি একটি আরও স্থিতিশীল এবং সহনশীল বিশ্ব তৈরিতে অবদান রাখতে পারে। ■

বন্দেমাতরম্ সংগীত

গত মাঘ সংখ্যার পর....

অধ্যাপক বিশ্বেশ্বর বেরা

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে 'বন্দেমাতরম্' গানটিকে বিধিবদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ করবার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করল। সেই সাব-কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র পত্রযোগে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কাছে জানতে চাইলেন—'বন্দেমাতরম্' জাতীয় সঙ্গীত হতে পারে কিনা? জগদীশচন্দ্র বসু তার প্রত্যুত্তরে লিখলেন—"যাহার কল্যাণে আমরা পরিপুষ্ট ও পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছি, সেই জন্মভূমি ও জননীর মধ্যে সন্তান কি ভেদ কল্পনা করিতে পারে? জননী জন্মভূমির নামের ধ্বনি হৃদয় হইতে স্বতঃই উৎসারিত হইয়াছে এবং উহা আপনা-আপনি সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ, ঐ ধ্বনি ভারতের অন্তর্নিহিত প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে।" ১৯৩৭ সালের ২৮শে অক্টোবর কলকাতায় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে জাতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, "Wherever the 'Bande Mataram' is sung at national gatherings only the first two stanzas should be sung, with perfect freedom to the organisers to sing any other song of an unobjectional character, in addition to or in place of the Bande Mataram song." ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে অনুমোদিত হল কিন্তু 'বন্দেমাতরম্'-এর সঙ্গে কিংবা তৎস্থলে অন্য কোন গান গাওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল না। দেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় সংগীতের সুর দেশের সামরিক বাহিনীতে এবং বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসগুলিতে ব্যান্ডে কিংবা অর্কেস্ট্রাতে বাজানোর প্রয়োজন দেখা দিল। তাছাড়া ১৯৪৭ সালে নিউ ইয়র্কে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীতের সুর ব্যান্ডে বাজানোর জন্য দাবী উঠল। তখন ভারতীয় প্রতিনিধিদলের কাছে শুধুমাত্র 'জন-গন-মন' গানের সুরের রেকর্ডটি ছিল। কিন্তু 'বন্দেমাতরম্' ব্যান্ড বাজানোর জন্য সুরের কোন রেকর্ড ছিল না। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় পার্লামেন্টে স্থির করা হয়—জাতীয় সংগীত হবে 'বন্দেমাতরম্' এবং জাতীয় সুর হবে 'জন-গন-মন'। পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল

নেহেরু বললেন—'বন্দেমাতরম্' হল ভারতের একমাত্র মহান জাতীয় সংগীত, কেননা ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। 'বন্দেমাতরম্'-এর সেই গৌরব ও মর্যাদা চিরকাল থাকবে—অন্য কোন গান সেই স্থান গ্রহণ করতে পারে না।

'বন্দেমাতরম্' গান মাতৃভূমির ভাবকল্পনার বাণীরূপ। দেশ বলতে কেবল একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড কিংবা জনসমষ্টিই নয়—দেশ হল মাতৃস্বরূপিণী এক আবেগময় সত্তা। এই গানের মধ্যে সর্বশক্তিময়ী ও অভয়দাত্রী স্বদেশমাতার ভাবমূর্তি অঙ্কিত হয়েছে। এই গান যখন কোটীকণ্ঠে কলকলনিনাদে উদগীত হয়েছে এবং ভুজৈর্ধৃতখর-করবালে বহুবল ধারণ করেছে তখন স্বাধীনতার সূর্যোদয় ঘটেছে—মাতৃ-আরাধনার পূজার বেদীতে ভারতমাতা প্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' সংগীতকে মন্ত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ঋষি বলে অভিহিত করেছেন। 'বন্দেমাতরম্' হল নব্যভারত গঠনের এবং ভারতজাতির পুনর্জাগরণের মন্ত্র। পণ্ডিত হরপ্রদাস শাস্ত্রী বলেছেন—''বঙ্কিমবাবু যাহা কিছু করিয়াছেন সব গিয়া এক পথে দাঁড়াইয়াছে। সে পথ জন্মভূমির উপাসনা—জন্মভূমিকে মা বলা—জন্মভূমিকে ভালোবাসা—জন্মভূমিকে ভক্তি করা।

সুতরাং তিনি আমাদের পূজ্য, তিনি আমাদের নমস্য, তিনি আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা। সেই মন্ত্র—'বন্দেমাতরম্' (বঙ্কিমচন্দ্র, পৃষ্ঠা-১৭৩)। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'নবযুগের বাংলা' গ্রন্থের 'বঙ্কিম সাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছেন—''আনন্দমঠে তিনি দেশমাতৃকাকে মহাবিষ্ণুর বা নারায়ণের অঙ্কে স্থাপন করিয়া আমাদের দেশপ্রীতি ও স্বদেশ সেবাব্রতকে সাধারণ মানবপ্রীতি এবং বিশ্বমানবের সেবার সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছে।'' 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে দেশের জন্য সন্তানদলের সর্বস্ব ত্যাগ ও সংগ্রাম, তাদের সন্ন্যাস ব্রত, দেশের প্রতি ভক্তি এবং সঙ্ঘশক্তির মূল প্রেরণাসঞ্চারী মন্ত্র হল 'বন্দেমাতরম্'। ইংরেজ গোলন্দাজ বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে 'আনন্দমঠে'র বৈষ্ণবী সেনা গেয়ে উঠেছিল—

''তুমি বিদ্যা তুমি ভক্তি
তুমি মা বাহুতে শক্তি
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।''

বঙ্কিমচন্দ্রের দেশমাতৃকা অমিত শক্তিদায়িনী—দুর্গার মতো দশপ্রহরণধারিণী। শুধু বাহুতে শক্তি নয়—দেশমাতা বিদ্যা-বুদ্ধি, ভক্তি ও ধর্মপ্রদায়িনী। দেশমাতার অপূর্ব ভাবময়ী রূপকল্পনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র—

''বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।''

'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির উচ্চারণ ছিল শাসক ব্রিটিশের কাছে দণ্ডনীয় অপরাধ। 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করার অপরাধে ছাত্রদের স্কুল থেকে বহিষ্কার, ফাইন ও বেত্রাঘাত করা হত। এমনকি রাস্তায় বা পাড়ায় কোনো ছেলে যদি 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করত তাহলে সেই সংবাদ পেয়ে পুলিশ এসে সেই এলাকার সকলকে নির্বিচারে মারধর করত। ব্রিটিশ পুলিশের লাঠি ও পায়ের বুটের আঘাতে নিরীহ নারী-পুরুষের দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় লিখলেন—স্বৈরাচারীর রক্তচক্ষু কোনদিন জাতির ভবিষ্যৎকে রোধ করাত পারবে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গাইলেন—

''ওদের আঁখি যত্র রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে।''

'বন্দেমাতরম্' গানটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন শ্রী অরবিন্দ—একটি গদ্যে, আর একটি পদ্যে। পণ্ডিত হরিনাথ দে ল্যাটিন এবং ইংরেজি ভাষায় 'বন্দেমাতরম্' গানটি অনুবাদ করেছিলেন।

পরিশেষে বলি, 'বন্দেমাতরম্' গানে দেশপ্রেম, ত্যাগ ও জাতীয়তাবোধের যে আদর্শ অন্তর্নিহিত রয়েছে তা চিরকাল আমাদের প্রেরণার বাণী। প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদকে দূরে সরিয়ে দেশের অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করতে হলে এবং জাতির প্রতি মমত্ববোধ ও সেবামূলক কর্মে ব্রতী হতে হলে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্'-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। ■

সহায়ক গ্রন্থ :

১। 'বন্দেমাতরম্'—অমলেশ ভট্টাচার্য, সূত্রধর প্রকাশনী।
২। 'আনন্দমঠ'—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৩। 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ'—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
৪। 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম'—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।
৫। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা—শ্রীঅরবিন্দ, ১৯০৭।
৬। 'নবযুগের বাংলা'—বিপিন্দ্রনাথ পাল।

রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদ

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

গত মাঘ সংখ্যার পর....

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অধ্যয়ন অত্যন্ত গুরুত্ব পায়। ততদিনে বিবেকানন্দের লেখা ও বক্তৃতা তত্ত্ব ও অনুশীলনে বাংলার জাতীয়তাবাদের নৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে যথেষ্ট অবদান রেখেছিল। প্রকৃতপক্ষে, তার লেখার মাধ্যমে তিনি অতীত সম্বন্ধে জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে গর্ববোধের জন্ম দিয়েছিলেন এবং আত্মসম্মান হারানো লোকদের সাংস্কৃতিক আস্থা দিয়েছিলেন। এমন এক সময়ে যখন ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা পশ্চিমাদের অনুকরণে ব্যস্ত ছিলেন, বিবেকানন্দ সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে পশ্চিমাদের ভারত থেকে অনেক কিছু শিখতে হবে। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সূচনা বোঝার জন্য, ১৯০৪ থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যে বিবেকানন্দের গাথা ও লেখায় পূর্ণ রাজনৈতিক সাহিত্য পড়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বিপ্লবীদের সঙ্গে বিবেকানন্দের যোগসূত্র

২০১২ সালে গোয়েন্দা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত পুলিশ রিপোর্ট থেকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে বিপ্লবীদের সঙ্গে বিবেকানন্দের যোগসূত্রের নতুন প্রমাণ পাওয়া যায় : ১। রামকৃষ্ণ মিশনের মঠগুলো প্রায়শঃ বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের সংগঠনের নোডাল পয়েন্ট ছিল, যা থেকে জাতীয়তা- বাদীদের রাজনৈতিক বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় ভারতের বেশ কিছু অংশে। বড় 'ষড়যন্ত্র' মামলার উদাহরণ বলতে আমরা লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার কথা উল্লেখ করতে পারি। রাসবিহারী বসু এবং সেই সঙ্গে অভিযুক্ত পাঁচজন বাঙালি যুবক হরিদ্বারে রামকৃষ্ণ মিশন শাখার সদস্য ছিলেন বলে অভিযোগ। একইভাবে ৩৩ মানিকতলা ষড়যন্ত্র মামলায়, যেখানে অরবিন্দ ঘোষ জড়িত ছিলেন বা তাঁকে জড়ানো হয়েছিল, অন্তত একজন অভিযুক্ত, প্রজ্ঞানানন্দ (দেবব্রত বসু) আলমোড়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের মায়াবতী আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২। অনেক সশস্ত্র বিপ্লবী ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত। বিখ্যাত বাঘা যতীন (যতীন মুখার্জি) মাঝে মাঝে আশ্রমে যেতেন। যারা নিয়মিত আশ্রম পরিদর্শন করতেন তাদের মধ্যে দুটো শ্রেণী ছিল—নবাগত, যারা আশ্রম ত্যাগ করে সশস্ত্র বিপ্লবে যোগ দিতেন এবং প্রাক্তন সশস্ত্র বিপ্লবী যারা পরবর্তী জীবনে মিশনে যোগ দিয়েছিলেন। ৩। স্বামী বিবেকানন্দের প্রকাশিত রচনা এবং তাঁর বার্তা তরুণদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য তাদের পাঠ্যসূচির অংশ ছিল। পুলিশ রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে বিপ্লবী দলগুলোর সদস্যরা বিবেকানন্দের শিক্ষাগুলোকে আত্মস্থ করেছিলেন এবং তাদের নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে যখন 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযান' সংঘটিত হয় ততদিনে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদের মধ্যে বিবেকানন্দের লেখা বইগুলোর প্রাপ্তিকে সশস্ত্র বিপ্লবী প্রবণতার যথেষ্ট প্রমাণ বলে মনে করে।

জাতি এবং জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি এইভাবে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে : (১)। জাতির শক্তি আধ্যাত্মিকতায়। (২)। প্রতিটি জাতি জীবনের একটা থিমের প্রতিনিধিত্ব করে। (৩) সাধারণ ঘৃণা বা ভালবাসা একটা জাতিকে একত্রিত করে। (৪)। জাতির সামর্থ্য নির্ভর করে মানুষের ভালোর উপর এবং (৫)। জাতিকে অবশ্যই তাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে ধরে রাখতে হবে।

চেন্নাই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের বেদান্ত কেশরী বলেছেন, ‘‘ভারতের কাছে পশ্চিমাদের প্রচুর পরিমাণ শেখার ছিল, এবং বিশ্বের সমস্ত জাতির মধ্যে একা ভারত এই বিশেষ কাজটি করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের এই অবস্থানটিই বিশিষ্ট যে সাহসের সঙ্গে তিনি এমন একটা সত্য ঘোষণা করেছিলেন যা তাঁর আগে কেউ করেননি, যা তিনি যেখানেই গেছেন সেখানেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং ঘুমন্ত ভারতীয় জাতিকে এমন এক অবস্থায় জাগিয়েছিল। আরও একবার আত্ম-সচেতনতা এবং এর ভিত্তিতেই-ভারতের সাংস্কৃতিক আত্ম-সম্মানের বিষয়ে তাঁর পুনঃপ্রকাশ—এই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দের আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতা হওয়ার দাবী টিঁকে আছে।’’

পশ্চিমী ঔৎকর্ষের প্রতি মুগ্ধতার মানসিকতা কাটাতে পেরেছিলেন

আমাদের শিক্ষিত লোকেরা, যারা পশ্চিমী ঔৎকর্ষের প্রতি মুগ্ধতার মানসিকতা কাটাতে পারছিলেন না, তাঁরা এই অদ্ভুত যুবক সন্ন্যাসীর কার্যকলাপ বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছিলেন এবং হতবাক হয়েছিলেন যে তিনি কীভাবে তার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের সমস্ত পূর্ব ধারণার বিরোধিতা করেছেন। কারণ তিনি পশ্চিমে গিয়েছিলেন শেখার জন্য নয়, শেখানোর জন্য, এবং তাঁর শিক্ষাগুলোকে সেই পশ্চিমী জাতিভুক্ত বহু সংখ্যক

সংস্কৃতিবান মানুষ যারা ভারতে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং যাদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য খুব শিক্ষিত ভারতও ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে শিখছিল তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেছিলেন।

পশ্চিমী সভ্যতার কেন্দ্রগুলোতেই তারা তাকে বেশ নির্ভীকভাবে এবং একজন ধর্মপ্রবক্তার দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে, ঘোষণা করতে দেখেছিল, কিভাবে ভারতের পাশ্চাত্যকে শেখানোর প্রচুর বিষয় ছিল এবং বিশ্বের সমস্ত জাতির মধ্যে একা ভারতই কিভাবে এই বিশেষ কাজটি করতে পারে।

জাতীয়তাবাদ এবং স্বাধীনতা স্বতন্ত্র

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে স্বতন্ত্র মত পোষণ করতেন। তিনি স্বাধীনতার প্রতি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন। স্বামী খ্রিস্টান মিশনারিদের সরাসরি সমালোচনা করতেন। কারণ তাঁরা ভারতীয়দের জর্জরিত সামাজিক ও বস্তুগত সমস্যার পূর্ণাঙ্গ ধারণা ছাড়াই ধর্মান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। যখন স্বামীজি বলেন, ''কেউ খালি পেটে উপাসনা বা ধ্যান করতে পারে না।" তখন এই বিবৃতি বুঝিয়ে দেয় কিভাবে বাইরে থেকে আরোপিত কিছু একটা জাতি বা ব্যক্তিসত্তার অবস্থা বুঝতে অক্ষম হয়। স্বামীজি ভারতের অন্তর্নিহিত হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার জন্য একটা স্বতন্ত্র উপায় তৈরি করেছিলেন। পশ্চিমের অনেকে একে পৌত্তলিকতার একটা রূপ বা দানবীয় কিছু হিসাবে দেখাতে চেয়েছিলেন তার পরিবর্তে স্বামীজি একে জাতীয়তাবাদী পরিচয়ের একটা অনন্য রূপ হিসাবে উপস্থাপন করে পুরনো এই ঐতিহ্যে ফিরে এসেছিলেন। স্বামীজি হিন্দু ধর্মের মধ্যে অদ্বৈত বেদান্তের কথা বলেছেন যা আধ্যাত্মিক পরিচয়ের বাহক। স্বামীজি যখন হিন্দুধর্মের কথা বলেন তখন তিনি এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেন যা তার নাগালের মধ্যে সর্বজনীন। এটা খ্রিস্টধর্ম সহ সমস্ত পাশ্চাত্য ধর্মীয় অভিব্যক্তির ভিত্তিকে হিন্দু ধর্মের মধ্যে টেনে নেয়। এই সময়েই স্বামীজি জাতীয়তাবাদ এবং স্বাধীনতাকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য একটা খুব স্বতন্ত্র পদ্ধতি গ্রহণ করেন। স্বামীজি আধিপত্যবাদী অন্য ধর্মের বিপরীতে মানবতাবাদী যুক্তিসমৃদ্ধ আদিম সনাতন হিন্দু ধর্মীয় অভিব্যক্তির দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেন।

স্বামীজি রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে পৃথিবীতে অস্তিত্বের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি থেকে উদ্গত বলে মনে করতেন। ব্যক্তিরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং জাতীয়তাবাদী পরিচয় খুঁজে পেতে পারে না যদি না এমন একটা দৃঢ় আধ্যাত্মিক ভিত্তি থাকে যা থেকে এই জাতীয় আদর্শকে শ্রদ্ধা করা যায়। স্বামীজি জাতীয়তাবাদ এবং স্বাধীনতাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন আত্মোপলব্ধির ফলে উদ্ভুত জ্ঞান থেকে যা ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সার্বজনীনতার উপর জোর দেয়। এদিক থেকে, এক জাতির অন্য জাতির দখলের কোন আধ্যাত্মিক বা নৈতিক ন্যায্যতা থাকতে পারে না। তদনুসারে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা আধ্যাত্মিক জাগরণ

সামাজিক কুফল দূর করার জন্যও কাজ করেছেন

তিনি জাতিভেদ প্রথার মতো সামাজিক কুফল দূর করার জন্যও কাজ করেছেন; পরদা প্রথা, অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি যা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতিরোধক ছিল। তিনি শিক্ষাকে সকল সামাজিক-ধর্মীয় সমস্যার সমাধান বলে মনে করতেন। তিনি শুধু জাতীয়তাবাদেই বিশ্বাস করতেন না, আন্তর্জাতিকতাবাদেও বিশ্বাস করতেন। ১৮৯৩ সালে শিকাগোতে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে, তিনি সমগ্র বিশ্বকে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, হিন্দুত্ব ইত্যাদির পাঠ শেখান। ড: রাধাকৃষ্ণন যথার্থই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, ''জাতীয়তাবাদ একটা রাজনৈতিক ধর্ম যা মানুষের হৃদয় ও ইচ্ছাকে আলোড়িত করে এবং তাদের সেবা ও আত্মত্যাগের জন্য জাগিয়ে তোলে এমনভাবে যা সাম্প্রতিক সময়ে অন্য কোন বিশুদ্ধ ধর্মীয় আন্দোলন করেনি।" ভারত এমন একটা প্রাচীন ভূমি যেখানে সংস্কৃতি, দর্শন, সভ্যতা, ধর্ম তাদের জন্ম নিয়েছে এবং শীর্ষ অবস্থানে পৌঁছেছে। এটা একটা সম্পূর্ণ আশীর্বাদধন্য পুণ্য ভূমি যেখানে বিশেষ বিভিন্ন ভৌগোলিক উত্থান-পতন রয়েছে। এটা সেই জায়গা যেখানে অনেক লোক তাদের বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে এতে আত্তীভূত হয়েছিল। এটা অনেক নিষ্ঠুর আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছিল, কিন্তু দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ ছিল। মহান অতীত ঐতিহ্যের কারণে, এটি এমন কিছু মহান ব্যক্তিত্ব দিয়েছে যারা বিশ্বকে একতা, মানবতা, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদির পাঠ শিখিয়েছে। বিবেকানন্দ তাদের একজন।

রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলেছিলেন, ''যদি ভারতকে জানতে চাও, বিবেকানন্দকে অধ্যয়ন কর।"

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তিনি জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে জাতিভেদ প্রথা, বাল্যবিবাহ, সতী প্রথা, পরদা প্রথা হল জাতির সংহতির বিধিনিষেধ। জাতিভেদ প্রথা ছিল ১৯ শতকের ভারতেঅন্যতম বড় সামাজিক কুফল। বর্ণপ্রথা ব্যক্তির পেশা বা চাকরির দ্বারা গঠিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯ শতকে এটি অন্য রূপ নিয়েছে। এখন ব্যক্তির বর্ণ তার জন্ম দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছিল। ব্যক্তির বর্ণ তার সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করত। উচ্চ বর্ণের লোকেরা নিম্ন বর্ণের লোকদের ঘৃণা করত। নিম্ন বর্ণের মানুষ তাদের দ্বারা শোষিত হয়েছিল।

তাদের কোন অধিকার ছিল না। তাদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার করা হত। এর পিছনে বিদেশী মুসলমান ও ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির দমন-পীড়ণ ও চক্রান্ত ছিল। কিন্তু যাই হোক এর অপনোদন জরুরী ছিল। বিবেকানন্দ জাতিভেদ প্রথায় খুব বিষণ্ণ হয়েছিলেন। তিনি বর্ণপ্রথার নিন্দাও করেছিলেন। তিনি বর্ণপ্রথাকে আমাদের অগ্রগতির অন্তরায় হিসেবে নিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি বর্ণ প্রথাকে বিশ্বাস করতেন কিন্তু বেদে যেমন বর্ণিত হয়েছে যার সঙ্গে তৎকালীন জাতপ্রথার কোনও মিল ছিল না। তা বিদেশী অত্যাচার ও কুচক্রের ফল। বিশেষ করে অস্পৃশ্যতা তার সবচেয়ে খারাপ অংশ। তিনি এই ধরনের 'ছুঁৎমার্গের' সমালোচনা করেছেন। তিনি সমাজ থেকে এই ধরনের গোঁড়ামি বিলুপ্ত করতে চেয়েছিলেন। বাল্যবিবাহ হল একটা নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছানোর আগে একজন ব্যক্তির আনুষ্ঠানিক বিয়ে যা সেই যুগের একটা বিশৈষ কু প্রথা ছিল।

নারী

তিনি বলেন, একটা জাতি নারীকে বাদ দিয়ে মহান জাতি হতে পারে না। তিনি সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রমুখের উদাহরণ দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরিবারের প্রচলিত মূল্যে বিশ্বাসী, কিন্তু তাদের পরাধীনতার বিরুদ্ধে।

নারী শিক্ষার ব্যবস্থা : হিন্দু/জৈন গুরুকুল পদ্ধতিতে বা মাদ্রাসায় নারী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৮১ সালে প্রথম আদমশুমারিতে মহিলা সাক্ষরতার হার ০.5% রেকর্ড করা হয়েছিল, ১৯০১ সালে ০.৬%-এ পৌঁছেছিল। সব ক্ষেত্রেই কন্যাশিশু হত্যার প্রবণতা ছিল না। রাজপুত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এটা প্রচলিত ছিল। তারা তাদের কন্যাদের হত্যা করে দিত, যাতে তারা হানাদারদের শিকারে পরিণত না হয়। দরিদ্র মানুষের আরেকটি অভিশাপ ছিল যৌতুক প্রথা। মেয়ের বিয়েতে খরচ করার মত তেমন টাকা ছিল না তাদের। তাই দারিদ্র্যের ভয়ে এবং অসম্মানের ভয়ে তারা খুব গোড়াতেই তাদের মেয়েদের হত্যা করত। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, কেশব চন্দ্র সেন প্রমুখ সমাজসংস্কারক এইসব অপকর্মের বিরোধিতা করেছিলেন। আর তাঁদের প্রচেষ্টায় বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯ শতকের শেষের দিকে এই অপরাধ বিলুপ্ত হয়। বিবেকানন্দও হিন্দু সংস্কারবাদী সংগঠন ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন। তারা বাল্যবিবাহ, সতী প্রথা, কন্যাশিশু হত্যা ইত্যাদি দূর করার জন্য কাজ করেছিলেন। প্রথমে অন্ন, তারপর ধর্ম। বিবেকানন্দের সমসাময়িক সংস্কারকরা মানুষকে অধিবিদ্যার শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু বিবেকানন্দের তত্ত্ব ছিল ভিন্ন। তিনি বলেছেন, ''খালি পেটে ধর্ম হয় না।'' তাই তিনি কারিগরি শিক্ষা এবং শিল্প প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ জোর দেন। কারণ তিনি এমন যন্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন যা সর্বোৎকৃষ্ট ধারণা নিয়ে আসবে দরিদ্রতম ও নিচু মানুষের দোরগোড়ায়। তিনি নারীদের শিক্ষার অধিকারের জন্যও কাজ করেছেন। তিনি নারীর ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। তিনি নারীকে সৃষ্টি শক্তি বলে মনে করতেন। তিনি বলেন, নারীরা শিক্ষিত হলে সমাজকে শিক্ষিত করে। বিবেকানন্দ বলেছিলেন : ''পাঁচশ অনুপ্রাণিত পুরুষের সঙ্গে ভারতকে রূপান্তরিত করতে আমার ৫০ বছর সময় লাগবে। অনুপ্রাণিত নারীদের সঙ্গে লাগবে কয়েক বছর।''

শিক্ষা প্রসার

তিনি সারা ভারতে অনেক স্কুলের পাশাপাশি পাবলিক লাইব্রেরি খোলেন, যাতে একজন সাধারণ মানুষ সহজেই পড়তে পারে। তিনি ইংরেজিতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' এবং হিন্দিতে 'উদ্বোধন' পত্রিকাও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জামশেদ টাটাকে একটা গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতেও বলেছিলেন। টাটা তাকে প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে প্রস্তাব করেছিলেন, তিনি প্রত্যাখ্যান করে তাঁর দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে শিক্ষা হল স্বাধীনতার সোনালী দরজা, তা খোলার একটা শক্তিশালী হাতিয়ার দরকার যা বিশ্বকে পরিবর্তিত করতে পারে। ১৮৯৭ সালের মে মাসে, তিনি কলকাতায় সমাজসেবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

এটার আদর্শ কর্ম যোগের উপর ভিত্তি করে। তিনি বলেছিলেন, প্রতিটি কর্মের নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তির জীবনের তার বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। হিন্দু জীবন শুরু করেন একজন ছাত্র হিসেবে, তারপর তিনি বিয়ে করেন, গৃহস্থ হন, বৃদ্ধ বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং সংসার ত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাসী হন। জীবনের এই প্রতিটি স্তরে কিছু কর্তব্য যুক্ত থাকে। এই পর্যায়গুলোর কোনটিই অন্যটির চেয়ে উন্নত নয়। গৃহস্থের জীবন ব্রহ্মচারীর মতোই শান্ত। ঝাড়ুদার রাজার মতো শান্ত এবং মহিমান্বিত। তিনি গৃহকর্তাকে উপদেশ দিলেন কর্মফলের কথা চিন্তা না করে নিজের কাজ করুন। সন্দেহ নেই, এটা খুবই সাধারণ কাজ। এর দ্বারা সে একই সঙ্গে গৃহস্থের পাশাপাশি সন্ন্যাসী জীবনযাপন করতে পারে।

অনুপ্রাণিত নারীদের সঙ্গে কয়েক বছর লাগবে। তিনি ঈশ্বর যাদবকে সম্মান জানানোর পক্ষে ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ, আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদ, এবং ভারতীয় রেনেসাঁ-১ একটা

স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র হিসাবে, ভারতকে এখনও সত্যিকারের মুক্ত হতে শ্রীঅরবিন্দের পরামর্শ মানতে হবে।

ভারত আজ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন। কিন্তু স্বাধীন ভারত কি তার অনন্য মেজাজ, তার আসল ভূমিকা এবং মিশনকে নতুন করে আবিষ্কার করার পথে? আমরা কি একজন মানুষ হিসেবে সত্যিকারের ভারতীয় নবজাগরণের দিকে কাজ করছি, যা ভারতের চিরন্তন চেতনা ও সত্যের উপর ভিত্তি করে? ভারত এক সভ্য জাতি এবং একটা আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের সুবিধার বিন্দু থেকে ভারতকে দেখা এবং জানার মানে শুধুমাত্র বাইরের পৃষ্ঠকে দেখা এবং জানা। আজ, যখন ভারত তার নিজস্ব পথে একটা গভীরতর উপায়ের পুনঃআবিষ্কারের প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা গভীর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে ভারতীয়দের অবশ্যই গভীর সুবিধার দিক থেকে ভারতকে জানতে হবে।

ভারতের নবজাগরণ শুধুমাত্র তার ভবিষ্যতের জন্য নয়, বিশ্বের ভবিষ্যতের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ কারণ একমাত্র ভারতই মানবতাকে একটা নতুন, একটা বৃহত্তর, একটা গভীর এবং উচ্চতর পথ দেখাতে পারে, প্রকৃতি, বহির্বিশ্ব ও অন্তর্বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং একে অপরের পরিপূরক।

ভারত বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার আগে, তার সন্তানদের অবশ্যই তার সত্তা, তার মূল প্রকৃতির প্রকৃত চেতনা এবং অনুভূতিতে পুনরায় জাগ্রত করতে হবে। আমাদের, ভারতীয়দের, ভারতকে তার আত্মায় কী আছে সেই সত্যকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে হবে। শুধুমাত্র তখনই সত্যিকারের ভারতীয় নবজাগরণ রূপ নেবে।

শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক ও বিপ্লবী কাজ তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবতা ও বিশ্বের আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে ভারতের মিশন এবং গন্তব্য সম্পর্কে তার যোগীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুপ্রাণিত। শুরুতেই বলতে হবে যে নিছক রাজনীতি কখনই শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবী কাজের শেষ লক্ষ্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, বন্দেমাতরম-এ তাঁর রাজনৈতিক লেখাগুলো স্পষ্টভাবে বলে যে আমরা এক যোগীকে দেখেছি। তিনি ৩রা জুলাই, ১৯০৭-এ লিখেছিলেন : ‘‘...মানুষের অগ্রগতির পরবর্তী মহান পর্যায়... বস্তুগত নয় বরং একটা আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং মানসিক অগ্রগতি...।’’ বলা যেতে পারে, তিনি মানুষের নিখুঁততা এবং অগ্রগতির পরবর্তী পর্যায়ে তার কাজ সম্পর্কে স্বজ্ঞাতভাবে সচেতন ছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতাকে শ্রীঅরবিন্দ মানবতার ভাগ্যের এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখেছিলেন। তিনি ভারতকে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জীবন্ত মূর্ত প্রতীক এবং মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অর্জনের ভান্ডার হিসাবে দেখেছিলেন। যেমনটি তিনি বন্দে মাতরমের জন্য একই সম্পাদকীয়তে লিখেছেন : ‘‘বিশ্বে বেঁচে থাকার জন্য ভারতে অবশ্যই স্বরাজ থাকতে হবে, একটা একক গর্বিত এবং স্বার্থপর জাতির বস্তুগত এবং রাজনৈতিক সুবিধার জন্য দাস হিসাবে নয়, মানব জাতির আধ্যাত্মিক এবং বৌদ্ধিক সুবিধার জন্য একটা স্বাধীন মানুষ।’’

শ্রীঅরবিন্দের কাছে ভারত হল বিশ্বের আধ্যাত্মিক যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে অজ্ঞতা ও অন্ধকারের শক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হবে। সেই বিপ্লবী দিনগুলোতে তিনি তাঁর বহু লেখায় ভারতের এই নির্ধারিত মিশন সম্পর্কে লিখেছেন এবং তাঁর বক্তৃতায়ও তা প্রকাশ করেছেন। এটি ছিল ভারতের আত্মার সত্য এবং মানবতার বৃহত্তর বিবর্তনীমূলক পদযাত্রায় তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার গভীর অভ্যন্তরীণ জ্ঞান, যা ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য তার সমস্ত কাজকে নির্দেশিত করেছিল, যার মধ্যে তিনি তার সহ বিপ্লবীদের অনুসরণযোগ্য অনেক উদাহরণ রেখেছিলেন। এই জ্ঞান কোন সাধারণ জ্ঞান ছিল না। এটা ছিল সেই জ্ঞান, যা একজন যোগী, ঋষির সত্য-দর্শন, দৃষ্টি থেকে উদ্ভূত। শ্রীঅরবিন্দের কাছে সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছিল ঈশ্বর-নির্দেশিত। তাঁর কাছে বিপ্লবও ছিল একপ্রকার যোগব্যায়াম, যার জন্য দরকার মহান আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণ।

‘‘আমাদের স্বরাজের আদর্শে অন্য কোন জাতি বা প্রশাসনের প্রতি ঘৃণা নেই যা এখন এই দেশে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে... আমাদের দেশপ্রেমের আদর্শ ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে এগিয়ে যায় এবং এটা জাতির ঐক্যের বাইরে দেখায় এবং কল্পনা করে মানবজাতির চূড়ান্ত ঐক্য। কিন্তু এটা ভাই, সমকক্ষ এবং মুক্তমনাদের ঐক্য যা আমরা চাই, মালিক ও দাসের ঐক্য নয়, গ্রাসকারী এবং গ্রাস করা।’’

জাতির ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি

বন্দেমাতরম্-এর পাতায় শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয়দের মনে করিয়ে দেন জাতি ও জাতীয়তাবাদের ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির কথা। নিম্নলিখিত দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে আমরা দেখতে পাই শ্রীঅরবিন্দ একটা জাতির সত্যকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন : ‘‘জাতি কি? আমরা পশ্চিমের স্কুলে পড়াশোনা করেছি এবং আমাদের নিজস্ব গভীর ধারণা এবং সত্য কথা ভুলে গিয়ে পশ্চিমের চিন্তাভাবনা এবং ভাষাকে বানাতে শিখেছি, এবং পশ্চিমের কাছে জাতি হল দেশ, এতটা ভূমি যেখানে এত কোটি লোক থাকে যারা এক ভাষায় কথা বলে এবং এক

রাজনৈতিক জীবন যাপন করে, তার পছন্দের একক শাসক ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। যখন ইউরোপীয়রা তার দেশের জন্য একটা জীবন্ত আবেগ অনুভব করতে চায়, তখন সে যে ভূমিতে বাস করে সেই ভূমিকে মূর্ত করে, অনুভব করার চেষ্টা করে যে পাশবিক পৃথিবীতে একটা হৃদয় স্পন্দিত হয় এবং তার নিজের বুদ্ধির একটা অস্পষ্ট বিমূর্ততাকে পূজা করে।"

"জাতীয়তার ভারতীয় ধারণা সত্য এবং গভীর হয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের দর্শন বস্তুর স্থূল দেহের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম দেহ আবিষ্কার করেছিল, তার মধ্যে দিয়ে দেখেছিল এবং আরও গভীরভাবে লুকিয়ে থাকা আরেক দেহের সন্ধান পেয়েছিল, এবং তৃতীয় দেহের মধ্যে চিরকালের জন্য উপবিষ্ট, অপরিবর্তনীয় এবং অবিনশ্বর জীবন ও রূপের উৎস আবিষ্কার করেছিল। স্বতন্ত্র বস্তুর ক্ষেত্রে যা সত্য, তা সাধারণ এবং সর্বজনীনের ক্ষেত্রেও সত্য। মানুষের ক্ষেত্রে যা সত্য, জাতির ক্ষেত্রেও তা সত্য।

"দেশ, ভূমি কেবলমাত্র জাতির বাহ্যিক দেহ, তার অন্নময় কোশ বা স্থূল ভৌতিক দেহ; জনগণ, লক্ষাধিক মানুষের জীবন, যারা তাদের উপস্থিতির মাধ্যমে জাতির দেহকে ধারণ করে এবং সজীব করে তোলে, তা হল প্রাণময় কোশ, জাতির জীবন-দেহ। এই দুটি হল স্থূল দেহ, মায়ের দৈহিক প্রকাশ। স্থূল দেহের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম দেহ, চিন্তা, সাহিত্য, দর্শন, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক কার্যকলাপ, আশা, আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা, পূর্ণতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমষ্টি, যা জাতির সূক্ষ্ম শরির তৈরি করে। এটি বাহ্যিক অস্তিত্বের মতোই মায়ের জীবনের একটা অংশ যা শারীরিক চোখে দৃশ্যমান।

"জাতির এই সূক্ষ্ম জীবন আবার জাতির কার্যকারণ দেহের গভীরতর অস্তিত্ব থেকে উদ্ভূত হয়, সেই অদ্ভুত মেজাজ যা তার যুগের অভিজ্ঞতা থেকে গড়ে উঠেছে এবং যা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলেছে। এই তিনটেই মায়ের দেহ, কিন্তু তাদের মধ্যেই রয়েছে তার জীবনের উৎস, অমর ও অপরিবর্তনীয়, যার প্রত্যেকটি জাতি নিছক একটা প্রকাশ, সর্বজনীন নারায়ণ, বহুর মধ্যে এক যাঁদের মধ্যে আমরা সবাই সন্তান।

"অতএব, আমরা যখন একটা জাতির কথা বলি, তখন আমরা সেই দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের পৃথক জীবনকে বোঝায়, কিন্তু আমরা একটা পৃথক সংস্কৃতি এবং সভ্যতাকেও বুঝিয়েছি, একটা অদ্ভুত জাতীয় মেজাজ যা পরিবর্তিত হওয়ার মতো গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছে। এগুলো আমরা জাতীয় জীবনে ঈশ্বরের একটা প্রকাশ আবিষ্কার করি যা জীবন্ত, পবিত্র এবং আরাধ্য। এটাকেই আমরা মা বলে থাকি। লক্ষ লক্ষ মানুষ জন্মে মরে; আমরা যারা আজ এখানে আছি, আগামীকাল এখানে থাকব না, কিন্তু মা হাজার বছর ধরে বেঁচে আছেন এবং আমরা মারা গেলে আরও হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকব।"

আলিপুর জেল থেকে খালাস পাওয়ার পর তার উত্তরপাড়া বক্তৃতায়, শ্রীঅরবিন্দ তার দেশবাসীকে সেই কাজের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যা ভারতকে মানবতার জন্য করতে হবে।

"যখন বলা হয় যে ভারতের উত্থান হবে, তখন সনাতন ধর্মই উঠবে। যখন বলা হয় ভারত মহান হবে, তখন সেই সনাতন ধর্মই হবে আমি মহান হব। যখন বলা হয় যে ভারত নিজেকে প্রসারিত করবে এবং প্রচারিত করবে, তখন সনাতন ধর্মই বিশ্বব্যাপী নিজেকে প্রসারিত করবে এবং প্রচারিত করবে। ধর্মের জন্য এবং ধর্মের দ্বারাই ভারত বিদ্যমান।"

সনাতন ধর্ম, চিরন্তন ধর্ম বলতে কী বোঝায় তাও তিনি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে একমাত্র সেই ধর্ম যা অন্য সকলকে আলিঙ্গন করে, যে ধর্ম তার কম্পাসে সমস্ত সম্ভাব্য উপায়গুলোকে আলিঙ্গন করে যার মাধ্যমে কেউ ঈশ্বরের কাছে যেতে পারে, সত্যিকারের সর্বজনীন, সত্যই চিরন্তন হতে পারে। একটা সংকীর্ণ, একচেটিয়া বা একটা সাম্প্রদায়িক ধর্ম শুধুমাত্র একটা সীমিত সময়ের জন্য এবং একটা সীমিত উদ্দেশ্যে বেঁচে থাকতে পারে।

ধর্ম, রিলিজিয়ন এক নয়

ধর্মকে প্রায়ই রিলিজিয়ন হিসাবে ভুল অনুবাদ করা হয়। পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী ঐতিহ্য হিসাবে 'রিলিজিয়ন'-এর ধারণা এই শব্দটাকে অনেক বিস্তৃত, উদার এবং বিস্তৃত ভারতীয় শব্দ 'ধর্ম'-এর সঙ্গে মিথ্যাভাবে বিভ্রান্ত করা হয়েছে, যা অনেক সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব তৈরি করে। চতুর্বেদী বদ্রিনাথ তার 'ধর্ম, ভারত এবং বিশ্ব ব্যবস্থা—একুশটি প্রবন্ধ' শীর্ষক প্রবন্ধের সংগ্রহে লিখেছেন :

"ভারতীয় সংস্কৃতি মৌলিকভাবে 'ধর্মীয়' ছিল বলে অনুমান করার চেয়ে গুরুতর প্রকৃতির আর কোন ভুল বোঝাবুঝি নেই, যে অর্থে 'ধর্ম' এবং 'ধর্মীয়' শব্দগুলো শতাব্দী ধরে পশ্চিমে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

"এগুলোকে বোঝায় মহাবিশ্বের স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস, ঈশ্বরের একটা কেন্দ্রীয় উদ্ঘাটন, সেই প্রত্যাদেশের একজন বার্তাবাহক, ঈশ্বরের সেই বার্তাবাহকের জীবন ও বাণী সম্বলিত একটা কেন্দ্রীয় গ্রন্থ, আদেশের একটা কেন্দ্রীয়

নিয়ম, একটা কর্পাস এগুলোর আলোকে মতামত এবং আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ecclesiastical আইন, এবং সেই প্রবিধান ও নিয়ন্ত্রণের তত্ত্বাবধানে পুরোহিতদের একটা শ্রেণিবিন্যাস। এগুলো সাধারণ, যদিও তাদের নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুতে খুব ভিন্ন, বিশ্বের ঐতিহাসিক ধর্ম হিসাবে বর্ণিত উপাদানগুলোর উপাদান।

''ধর্ম, সর্বজনীন ভিত্তি যার উপর সমস্ত জীবন স্থাপিত, তা 'ধর্মের' চেয়ে অপরিমেয়ভাবে বেশি; ভুলবশত একটাকে অন্য হিসেবে নেওয়া হয়েছে। এই বিভ্রান্তির কারণেই আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির বেশিরভাগ পাশ্চাত্যের ভুল ধারণা খুঁজে পেতে পারি। যেহেতু আমাদের অনেক রাজনৈতিক ও আইনী প্রতিষ্ঠান সেই ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত; তাই বেশিরভাগ সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হয়, যেগুলোর মুখে আজ ভারতের মানুষরা পড়ছেন।''

উপসংহার

প্রথমত আমরা কতগুলো মৌলিক সত্যকে স্বীকার করব। সবার থেকে সব কিছু আশা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ যতটা চিন্তাবিদ, ভাবুক ছিলেন ততটা কর্মী ছিলেন না। তিনি একজন সাহিত্যিক এবং তার মধ্যেও কবিতাই তাঁর মূল বিচরণক্ষেত্র। তবুও তিনি তাঁর স্বভাব বহির্ভূতভাবে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হয়েছিলেন বিচ্ছিন্নভাবে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও জালিয়ানবাগওয়ালা হত্যাকান্ডের সময়ে। কিন্তু যেহেতু তিনি চিন্তাবিদ তাঁর জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ধারণা তাঁর অসংখ্য লেখায় ছড়ানো আছে। তাঁর গান কবিতায় জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিহিত আছে। আমরা এখানে তাঁর পুনরুচ্চারণ করব না। যে কোনো অনুরাগী তাঁর রচনাবলী পাঠ করলেই জানতে পারবেন। অনেকেই ইতিমধ্যে তা জানেন। অন্যদিকে বিবেকানন্দ যতটা কর্মী ছিলেন ততটা ভাবুক ছিলেন না। তাঁর সব ভাবনার মূলে ছিল পরাধীন ভারতবাসীর দুর্দশামোচন। তিনি কবি সাহিত্যিক ছিলেন না। লক্ষ-কোটি পীড়িত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যন্ত্রণা যাঁর মাথার শিরায় দাপাদাপি করত, তিনি কর্মী হতে বাধ্য। তাঁর সব দার্শনিক চিন্তা সেই মানুষকে ঘিরে। তার ফলে তিনি সাময়িকভাবে কবিতা উপন্যাসকে দূরে সরিয়ে মঠ স্থাপন করে মানুষের সেবা কাজের উদ্বোধন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সরাসরি মানুষের সেবা কাজে যুক্ত হননি (একেবারে হননি তা বলছি না, সে কথা অন্যত্র হবে)। তিনি ভাষা জননীর সেবা করে গেছেন। ভাষাও আমাদের মা। আর সফ্ট পাওয়ার বলতে বোঝায় সামরিক, অর্থনৈতিক শক্তি, শিল্প, বাণিজ্য বাদে অন্য শক্তি যেমন সাহিত্য, শিল্প, চারুকলা, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, খেলাধূলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এইসব। রবীন্দ্রনাথ একার চেষ্টায় সেই সফ্ট পাওয়ারকে কয়েক যোজন এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্তর্প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন বিবেকানন্দের সঙ্গে একই নৌকার যাত্রী।

অন্যদিকে শ্রীঅরবিন্দ ১৮৯৩ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত ছিলেন নিরলস কর্মী। কিন্তু মানিকতলা বোমা মামলার পর তিনি বুঝেছিলেন ব্রিটিশ রাজশক্তি তাঁকে আজীবন কারারুদ্ধ করবেন বা নির্বাসন দেবেন। কিন্তু যতটা কর্মী তার থেকে আরো দৃঢ় ধরনের আধ্যাত্মিক দার্শনিক। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কবলমুক্ত চন্দননগর হয়ে পন্ডিচেরী চলে গেলেন আরো উচ্চতর আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য। তাঁর দর্শন ছিল অনেক বেশি তাত্ত্বিক। এই দিক থেকে অধ্যাত্ম চিন্তায় তিনি প্রাগোক্ত দুইজনকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার মননে চিন্তায় ছিল সনাতন ভারতের মানবতাবাদী ধর্ম, একদেশদর্শী রিলিজিয়ন নয়। ■

তথ্যসূত্র :

১। স্বামী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ রচনাবলী খন্ড-১,১৯৩৬ পৃ-১৪০। ২। ভি.পি. ভার্মা, মডার্ন ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল থট, ১৯৮০, পৃ-১১৭। ৩। বিষ্ণো ভগবান, ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল থিঙ্কার্স, দিল্লি, ১৯৯৯, পৃ-১৯৪। ৪। বিসি পাল, দ্য স্পিরিট অব ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম, পৃ-৩৬। ৫। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, খণ্ড-২, পৃ-৬৯৯। ৬. পৃ-৭৮২। ৭। 'জনগণের প্রতি আমাদের কর্তব্যদ, স্বামী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ রচনা, খণ্ড-৬' ঋ-৩০৮। ৮। 'স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম' সব্যসাচী ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, ২০১২, পৃ-৩৮১-এর বুলেটিনে প্রকাশিত।

বনভোজন, ব্রহ্মপুর জেলা, মধ্যবঙ্গ

বাবরি ধাঁচা ভাঙার প্রেক্ষাপটে : বাংলাদেশের হালচাল, ১৯৯২

ওমপ্রকাশ ঘোষ রায়

গত পৌষ সংখ্যার পর....

সেই দিনটি ছিল ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর। আর সেই দিনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের সকল ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে শুরু করে আরবিয়ান দেশগুলিতে নিরীহ হিন্দুদের উপর অত্যাচারের সীমাহীন মাত্রা কল্পনাতীত ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। শুধুমাত্র বাংলাদেশেই আড়াই হাজার হিন্দু মন্দির ভেঙে ফেলা হয়েছে ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা নির্যাতিত হয়েছে। অমল কুসুমরা তখন ঘরবন্দী ছিল। কখন যে কোন দিক থেকে মুসলমানরা আক্রমণ করে, তা বলা যাচ্ছিল না। সেই অভিশপ্ত দিনটিতে অমল শুয়েছিল ঘরে, পাশে ছিল তার ছোট মেয়ে চম্পা। না দু-চোখে কারো ঘুম ছিল না। শুধুই দূর হতে ভেসে আসছিল উত্তেজিত জনতার জঙ্গি মিছিলের গর্জন আর আল্লাহ হু আকবার ধ্বনি। এমনি সময় তার মেয়ে হঠাৎ বলে উঠলো, 'ও বাবা দেখো না ঘরের ভেতর কত রক্ত। ওই দুষ্ট লোকগুলো কি আমাদের ধরতে আসছে? ওরা কি আমাদের কেটে ফেলবে?' ভয়ে অমলকে জড়িয়ে ধরে ওর মেয়ে। মেয়ের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনে তাকে অভয় দিয়ে অমল বলে, 'কোথায় রক্ত? কোথায়? এত বেলা শেষের পশ্চিমে হেলে পড়া সূর্যের রক্তিমাভা, জানালা দিয়ে ঘরের কমলা রঙের দেয়ালটাকে লালের লালিমায় রাঙিয়ে দিয়েছে।' এমনিতেই সেই দুর্যোগের দিন, রাতটা জেগে কাটিয়েছে, তার ওপর শহরে হিন্দু মহল্লায় আর শহরতলীতে নানা অত্যাচার নির্যাতনের খবর লোকমুখে শুনে শুনে মনটাই খারাপ হয়ে গেছে অমলের। রাতটুকু ভালোয় ভালোয় কেটে যায়। পরদিন অমল কুসুম বাইরে বেরোবার আয়োজন করতেই, ঘরের সকলেই নিষেধ করে বলে, 'এই সংকটময় সময়ে না বেরোলেই কি নয়?' কেননা শহরে, গ্রামে-গঞ্জে, দেশব্যাপী হিন্দুদের উপর হামলা হয়েই চলেছিল, থামার কোন লক্ষণ নেই। প্রশাসন আর পুলিশ নীরব দর্শক হয়ে রয়েছে। যাই হোক, অমল 'এই আসছি' বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

চারিদিকের থমথমে পরিস্থিতি। অমলদের পাড়াটা কোনক্রমে মুসলমানদের আক্রমণ হতে রক্ষা পেয়েছে। কেননা বাইল্ল্যা বলে এক আধ পাগলা গো-পালক ছিল সার্জেন্ট চাচার। সে একাই বাক্যবাণের তুবড়ি ছুটিয়ে দুষ্কৃতিদের মিছিলকে পাড়ায় ঢুকতে দেয়নি। অমলদের গলি থেকে বেরিয়ে প্রথমেই পড়ে লায়ন সিনেমার লাগোয়া রাজেশ্বর কালী মন্দির ও সদরঘাট কালী মন্দির। এই মন্দির দুটো প্রতিমা বিহীন লন্ডভন্ড অবস্থায় খাঁ খাঁ করছে। এই দুই মন্দিরের ট্রাফিক মোড়ে বেশ কয়েকটি প্রতিমা অর্ধ জলন্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। স্থানীয় পানের দোকানীর কাছে জানতে পারে, দেববিগ্রহগুলো গতকাল রাতেই বোস ব্রাদার্সের এক ড্রাম কেরোসিন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে আর মন্দির লুটপাট করেছে মুসলমানরা। পুলিশ ছিল, কিন্তু নীরব দর্শকের ভূমিকায়। অমলের চোখে পড়ে পাহারাদার পুলিশগুলো মন্দিরের বারান্দায় জুতোগুলো ঝুলিয়ে রেখে বিশ্রাম নিচ্ছে। বিধ্বস্ত মন্দিরের আবাসিকরা কেউ নেই।

পথে লোক চলাচল তেমন নেই বললেই চলে। তবে হুঁস-হাস করে গাড়ি ছুটে চলেছে রাজপথ দিয়ে। মাঝে মাঝে পুলিশের ভ্যান গাড়িও ছুটছে। বিপণী বিতানের মোড়ে এসে অমল, তারই কলেজ জীবনের বন্ধু কামারুলজ্জামানের দেখা পেয়ে একটু উৎসুকতা নিয়ে এগিয়ে যেতেই, সে না দেখার ভান করে রাস্তার অপর ধারে চলে গেল। কেন যে সে এমন ব্যবহার করল? সেটা ভাবতে গিয়ে হোঁচট খেল অমল। সবই কি বাবরি মসজিদ ভাঙার কারণে? এমন সময় আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে একদঙ্গল মুসল্লী কয়েকটা লরি সার বন্দী হয়ে আগ্রাবাদের দিকে চলে গেল, তার পেছনে পুলিশের গাড়িও ছিল। অমল হাঁটতে হাঁটতে নন্দনকানন পেরিয়ে তুলসী ধামের কাছে পৌঁছাল। ধামে ওঠার পথের পাশেই রয়েছে কথাশিল্পী সুচরিত চৌধুরীর বাসা। বাসার গেটটা বন্ধ ছিল, বন্ধ দরজায় কয়েকবার টোকা দিতেই, বৌদি এসে দরজা খুলে দেন। অমল দেখে সুচরিতদা বারান্দায় বেতের মোড়ায় চিন্তান্বিত মনে বসে আছেন। পাশেই পড়ে আছে সেদিনের দৈনিক পত্রিকাটা। অমল কুসুমকে দেখেই, সুচরিতদা একটা খালি মোড়াতে তাকে বসতে বলল। অমল বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছেন দাদা?' তিনি বিরস মুখে বললেন, 'কি আর থাকবো? দেখতেই তো

পাচ্ছ, বেঁচে আছি'। বলেই একটু হেসে বলে উঠলেন, 'এমন দুঃসময়ে একমাত্র তুমিই এলে আমাদের খোঁজ নিতে'। এই ফাঁকে মীরা বৌদি চা-বিস্কুট দিয়ে গেলেন। সুচরিতদা খেদোক্তি করে বলতে থাকেন, 'কোথায় বাবরি মসজিদ ভাঙল, আর আমাদের উপর হামলা চালালো মুসলমানরা। আমরা হিন্দু হয়ে কি অপরাধ করেছি? গত কয়েকদিন ভয়ে ভয়ে ঘরবন্দী হয়ে কাটিয়েছি। গতকালই পাহাড়ের উপর তুলসী আখেরাতে ও আক্রমণ করেছে দুষ্কৃতিকারীরা। আশ্রমটাকে একেবারে তছ্‌নছ্ করে দিয়েছে। আশ্রমবাসী কয়েকজন ছাত্র আমার বাসায় আশ্রয় নিয়েছিল। আজ ভোর হতেই ওরা কোথায় চলে গেল জানতেই পারিনি।' কথা প্রসঙ্গে আরো বললেন সুচরিতদা, তার বাবা আশুতোষ চৌধুরী যিনি একজন প্রখ্যাত পল্লীগীতি গবেষক ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন, সপরিবারে শান্তিনিকেতনে গিয়ে থাকবেন এবং সেখানে একটা জায়গাও পছন্দ করেছিলেন। কিন্তু তার জীবদ্দশায় মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি। এবার বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনায় সুচরিত বাবুও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এই অবসর জীবনের প্রান্ত সীমানায় এসে ভারতেই চলে যাবেন, তাঁর একমাত্র সন্তানের ভবিষ্যৎ কামনা করে।

অমল কুসুম আর দেরি করে না, সুচরিতদা ও মীরা বৌদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজপথে নেমে আসে। হাঁটতে হাঁটতে বৌদ্ধ মন্দিরের কাছে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক অরুণ দাশগুপ্ত (দাদামনি)র সঙ্গে দেখা হয়। বাবরি মসজিদ ভাঙার সন্ত্রাস নিয়ে তিনি অতটা ভেঙে পড়েননি, তবে চিন্তিত ছিলেন তাঁর আত্মীয়-স্বজন যারা গ্রামে গঞ্জে থাকতেন তাদের জন্য, আর এমন মুসলমানদের হামলা স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে বললেন। এত জানা কথাই বাংলাদেশ ইসলামিক দেশ, যেখানে ৯০% মানুষ মুসলমান, অতএব ভারতে মসজিদ ভাঙা নিয়ে এমন বিপরীত প্রতিক্রিয়া তো হবেই। অরুণবাবুর স্বভাবসিদ্ধ আতিথেয়তায় সিঙারাটাও খেতে হল। অবশেষে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে, হাঁটতে হাঁটতে স্টেডিয়ামের উল্টোদিকে ধোপা পট্টিতে অমলের কয়েকজন ছাত্রের বাসা রয়েছে। তাদের খোঁজ নিতে গিয়ে, ধোপা পট্টির পরিস্থিতি দেখে থ-মেরে গেলেন তিনি। সম্পূর্ণ হিন্দু পট্টিটা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। কোন লোকজনই দেখতে পেলেন না সেখানে। শুধু পোড়া ভিটেতে আধপোড়া কাপড়ের স্তূপগুলো তখনো ধিকি ধিকি জ্বলছে। সেই পোড়া ভিটেতে অমল তার এক ছাত্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে যায়। ছাত্রটি স্যারকে দেখেই কান্নায় ভেঙে পড়ে, অমল কুসুম হতবম্ভ হয়ে পড়ে, সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে ভাষা হারিয়ে ফেলে। তার মা-বাবার কথা জিজ্ঞাসা করতেই, ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে বলে, গতকাল রাতে দুষ্কৃতিরা যখন আগুন লাগাচ্ছিল তখন ধোপা পট্টির মা-বোন আর শিশুরা ধোপাপট্টি লাগোয়া শিক্ষামন্ত্রী বাংলার বিবেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সুরক্ষিত বাসভবনে একটু আশ্রয়ের জন্য গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে আশ্রয় দূরে থাক, কোন সাড়াই মেলেনি। ধোপা পট্টির লোকজন যে যে দিকে পেরেছে পালিয়ে বেঁচেছে। আর লুটপাটের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের শ্লীলতাহানি করেছে দুষ্কৃতিকারীরা। যদিও অনতিদূরে সার্কিট হাউজের পুলিশ বাহিনী নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখেছে।

ধোপা পট্টির পাশ কাটিয়ে একটু এগোতেই দেখা হল বাংলা হোটেলের মালিক কাজী শাহাজাহানের সঙ্গে। সে আবার ৫ দলের বিশিষ্ট নেতাও। অমল কুসুম আর উনি দুজনেই কলেজিয়েট স্কুলে একত্রে লেখাপড়া করেছে। শাহজাহান স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখে রসিকতা করে বলে ওঠে, 'কিরে অমল তোরা যে আমাদের মসজিদটা ভেঙে দিলি, এটা কি ভালো করেছিস?' অমল কুসুম একটু অবাক হয়, যেন ভারতের বাবরি মসজিদটা ভাঙার জন্য সেই দায়ী, আর এই বাংলাদেশে হিন্দু হওয়াটাই যেন অপরাধ। যাই হোক, অমলকে গিয়ে শাহাজাহান তার হোটেলে বসিয়ে চা পানে আপ্যায়ন করে। এবং অনেক কথাবার্তা হল বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার নিয়ে। আর মন্দির মঠ ভাঙার জন্য তার আক্ষেপ, সরকার দুষ্কৃতকারীদের প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি বলে। তাছাড়া সংখ্যালঘুদের প্রতি এহেন অমানবিক অত্যাচারের পেছনেও সরকারের সংখ্যাগুরুদের মন রক্ষায় কিছুটা প্রচ্ছন্ন মদতও রয়েছে বলল। তবে সে এও বলল যে, তার হোটেলে বেশ কিছু ধোপা পট্টির নারী ও শিশুকে সে আশ্রয় দিয়েছে। অবশেষে বাংলা হোটেল থেকে বেরিয়ে আলমাস সিনেমার পাশের এক মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিংয়ের আবাসিক অমলের পরিচিতি বিশিষ্ট চারুকলা শিল্পী অধ্যাপক দেবদাশ বাবুর ফ্ল্যাটে খোঁজ নিতে গিয়ে, তার ছেলের কাছ থেকে জানতে পারলো তিনি নাকি বাজার করতে বেরিয়েছেন। যদিও গত বছর

কোরবানির সময় অমল আর সুচরিত বাবু তার সঙ্গে দেখা করতে এসেও দেখা পায়নি। তখন তার ছেলে বলেছিল, বাবা নাকি কোরবানির পশু কিনতে গেছে। এই দেববাবু এক মুসলমান রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করেছিলেন।

যাই হোক, অবশেষে সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে আস্কার দিঘির পাশের গলিতে অমল তার এক সহপাঠী বিশিষ্ট গায়ক বাবুলালের বাসায় ঢুকে পড়ে। এই হিন্দু অধ্যুষিত পাড়াটা একেবারে শুনশান হয়ে পড়েছে, যেন কারফিউ চলছে। বাবুলাল ঘরেই ছিল, অমল কুসুমকে সহাস্যে আমন্ত্রণ জানায়। তার কাছেই অমল শুনলো, তাদের পাড়ার গলির মুখে যে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমটা রয়েছে, সেখানের মন্দিরটা দুষ্কৃতকারীরা আক্রমন শানিয়ে ভাঙচুর করে লুটপাট করেছে। সেখানকার আশ্রমবাসীরা এবং আশ্রমিকরা অত্যাচারিত হয়ে যে যেভাবে পেরেছে পালিয়ে গেছে। বাবুলালরাও ভয়ে ভয়ে ছিল, কিন্তু তাদের বাসায় মালিক ছিল মুসলমান, তাই কোনক্রমে রেহাই পেয়েছে, কিন্তু তাদের বাসার পেছনের হিন্দু বস্তিটা সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দিয়েছে। বাবুলালের স্ত্রীর আপ্যায়নে কোন ত্রুটি ছিল না।

যাই হোক, আস্কার দিঘির গলি হতে বেরিয়ে বাসে চেপে বহদ্দারহাট কলোনিতে আমলের এক প্রাইভেট ছাত্রের বাসায় উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায় সে, তখন দুপুর প্রায় ২:০০ বাজে। সেখানে পৌঁছাতেই, এমন দুর্যোগময় মুহূর্তে অমলকে দেখে অবাক হয়ে গেল সবাই। ওদের মানসিক অবস্থা অত ভালো নয়, যদিও ওদের দালানে হামলা হয়নি, কারণ বেশিরভাগ ফ্ল্যাটবাসী মুসলমান। ছাত্রের মা জানাল মুরাদপুরের হাজী কলোনিতে গার্মেন্টসের প্রায় ৩০০ হিন্দু মেয়ে শ্রমিক ভাড়া থাকতো। সেই হাজী কলোনির মালিক হাজী সাহেবের দুই ধর্মান্ধ জিহাদী ছেলের সহায়তা দুষ্কৃতকারীরা পুরো কলোনি লুটপাট করে উজার করে দিয়ে, মেয়েদের ওপর সীমাহীন অত্যাচার করেছে। হাজী কলোনি থেকে কয়েকটা মেয়ে পালিয়ে এসে তাদের এখানে বাসায় আশ্রয় নিয়েছিল, তারা এখনও গোপনে এখানেই রয়েছে। পরিস্থিতি ভালো হলে ওরা গ্রামের বাড়িতে চলে যাবে। তিনি আরো একটা দুঃসংবাদ শোনালেন, তাদের পাশের ফ্ল্যাটের এক অধ্যাপকের ছোট বোনকে তিনি তার মুসলমান কালিগের বাসায়, বাবরি মসজিদ ভাঙার আগের দিন সকালে রেখে এসেছিলেন। সেই মেয়েটার আজ দুই দিন কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। কানাঘুষো হচ্ছে, যে ওই অধ্যাপকের বন্ধুর ছোট ভাই নাকি জোর জবরদস্তি করে মেয়েটিকে বলাৎকার করে এবং ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করেছে। এমনই সব দুঃসংবাদ শুনে অমল কুসুমের মনটা বিষন্ন হয়ে ওঠে, হিন্দু হওয়াটাই এদেশে যত অপরাধ! আগামী দিনে আরো যে কি হবে কে জানে?

অমল কুসুম আর দেরি না করে ঘরে ফেরার পথ ধরে। তখনই বাসের মধ্যে দেখা হয়ে গেল তারই এক সাংবাদিক বন্ধু সুখময়ের সঙ্গে। সুখময় বলল, সে আন্দরকিল্লা যাচ্ছে, কয়েকজন সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের বন্ধু সেখানে রহমানিয়া রেস্টুরেন্টে জড়ো হয়েছে, তার জন্য অপেক্ষা করছে। সে অমল কুসুমকে সঙ্গী হতে বলে, অগত্যা অমল আন্দরকিল্লাতেই নেমে পড়ে। রেস্টুরেন্টে উপস্থিত রয়েছে, কবি সুনীল নাথ, মৃদুল গুহ, আব্দুল ওয়াজিত, শ্যামল ওহেদুদ, নির্ঝর দত্ত, অমূল্য বসাক এবং আরো কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধু, সকলে উপস্থিত হলেন এক প্রস্থ চা হল। বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশব্যাপী সংখ্যালঘুদের উপর দুষ্কৃতিদের হামলা ও হিন্দুদের মন্দির ভাঙা, নারী নির্যাতন, হিন্দুর ঘর, বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লুটপাটের ঘটনাবলীর বিস্তারিত আলোচনা। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করল, সরকারের গা-ছাড়া মনোভাব এবং পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার জন্যই, সকলেই সমালোচনায় মুখরিত হয়েছে। শুধু আলোচনা সমালোচনা ছাড়া তাদের আর কোন কিছুই করার নেই, সকলেই শক্তিহীন নিধিরাম সর্দার। আর বাংলাদেশের হিন্দুরা তো খাঁচার মোরগ, ধরো আর জবাই কর। এমনি সময় দু-দুটো জঙ্গি মিছিল এল, আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে প্রায় সকলেই জেহাদী মুসল্লী। অমল কুসুমরা আর বেশি দেরী করে না, যে যার পথে চলে গেল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে, অমল ঘরে ফিরে যায়। তার মা-বাবা ও পরিবার পরিজন তাকে ঘরে ফিরতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

পরদিন অমল কুসুম তার কর্মক্ষেত্র স্কুলে যাওয়ার পথে রেলওয়ে কলোনিতে, তারই স্কুলের একদল ছাত্রকে দেখল জটলা করতে এবং তাকে দেখতে পেয়ে ওরা বলাবলি করতে থাকে, 'এইরে ঢেঁচাইয়া মাস্টার যায়গৈ' অর্থাৎ তাদের হিন্দু শিক্ষক যাচ্ছে। অমল না শোনার ভান

করে তাদের পাশ কাটিয়ে স্কুলে পৌঁছে যায় এবং যথারীতি কর্তব্য কর্মে রত হয়ে পড়ে। ক্লাস বিরতির সময় অমলের একজন কলিগ কেফায়েত উল্লাহ অযাচিত ভাবে চা-মিষ্টি আপ্যায়ন করে। কেননা বাবরি ধাঁচা ভাঙার দিনে তার ছোট ভাই নাকি অমলদের স্কুলেরই এক হিন্দু ছাত্রীকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছে এবং জোর জবরদস্তি করে বিয়েও করেছে। এই মেয়েটা তার মা-বাবার সঙ্গে মাদারবাড়ি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় থাকতো। মেয়েটি নাকি মসজিদ ভাঙার দিন ভয়ে স্যারের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, অতএব রক্ষকই ভক্ষকে পরিণত হয়েছে। আর এই শুভ সংবাদে কেফায়েত উল্লাহ একেবারে খুশিতে আটখানা হয়েছে। যেহেতু একজন হিন্দু মেয়েকে তার ভাই মুসলমান ধর্মে দাওয়াত দিতে পেরেছে, এর চাইতে বড় সু-উন্নতি আর কিছুই নেই। অমল কুসুমের কর্মস্থল স্কুলে হাজার খানেক ছাত্রীদের মাঝে মাত্র জনা দশেক হিন্দু ছাত্রী রয়েছে, তার মধ্যে এই ধর্মান্তরণ। এমনি অবাঞ্ছিত ঘটনায় স্বামীজীর একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য, 'হিন্দুধর্ম থেকে একজন ব্যক্তি অন্য ধর্মে চলে যাওয়ার অর্থ শুধুমাত্র একজন হিন্দু কমে যাওয়া নয়, হিন্দু ধর্মে একজন শত্রু বৃদ্ধি পাওয়া। সর্বোপরি মেয়ে হলে তো বংশবিস্তার করে সেই ধর্মের বিস্তার লাভে সহায়ক হওয়া বোঝায়।'

ভারতের অযোধ্যায় তথাকথিত বাবরি ধাঁচা ভাঙার জন্য বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বের ইসলামী দেশগুলিতে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা, লুটপাট ও সকল হিন্দু মন্দির ভাঙা, অগ্নিসংযোগ, হিন্দু নারী ধর্ষণ ও ধর্মান্তকরণের সংবাদ শুনে অমল কুসুমের পরিবারের সকলেই হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে। তারা ভাবতেই পারছে না আগামী দিনগুলোতে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপায় কি হবে? তাদের হাজার বছরের পিতৃপুরুষদের আবাসভূমি কি পরিত্যাগ করে চলে যেতে হবে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতবর্ষে? ভাবতেই পারছে না তারা। অনেক কটি সম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মন্বন্তর ও রাষ্ট্র বিপ্লবের মধ্যেও তারা রয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের মাটি কামড়ে, এবার কি সব ছেড়ে পরবাসী হতে হবে? এই বাংলার মাটি কি পরদেশী হয়ে গেল? তার চৌদ্দ পুরুষের ভিটে ছেড়ে, যে মাটি তার অতীত বংশধররা মিশে রয়েছে, এই সকল ভাবনার ভাবিত হয়ে মা মাটির মায়া ছেড়ে স্বধর্ম রক্ষার্থে অমলের পরিবারের সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয় আর এদেশে থাকা নয়, স্বদেশ ছেড়ে ভারতে চলে যাবে। উদ্বাস্তু হলেও তো হিন্দু হয়ে স্বাধীন ভাবে স্বধর্ম বজায় রেখে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকারটুকু পাবে। অতএব যেমনি ভাবা তেমনি কাজ, এই বছরের মধ্যেই ভারতে চলে আসে তারা। শুরু হল কন্টকাকীর্ণ জীবন যাত্রা। অন্য আরেক জীবনযাপন, নবতর পর্যায়ে অচেনা অজানা পথ চলা।

পুনশ্চ : প্রায় ৫০০ বছরের শাপগ্রস্ত রামচন্দ্রের জন্মস্থান বর্বর বাবরের নির্দেশে তারই সেনাপতি মীর বাঁকী কর্তৃক মন্দির পরিবর্তন হয়ে অভিশপ্ত বাবরি ধাঁচা ভেঙে মোহ মুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের এই স্বাধীন ভারতের ৭৭তম স্বাধীনতা বর্ষে। আর যে সকল লক্ষ লক্ষ হিন্দু রাম ভক্ত কর সেবক মরণজয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মুক্তির মন্দির সোপান তলে আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাঁদের এই আত্মত্যাগ বিফলে যায়নি। উল্লেখ্য আলোচ্য গ্রন্থ লেখকের প্রকাশিত অপর গ্রন্থ 'দেবালয় থেকে দেবালয়ে' রাম মন্দিরের বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ রয়েছে।

অতি সম্প্রতি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে রামচন্দ্রের জন্মস্থলে মন্দির প্রতিষ্ঠার কান্ডারী হলেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদিজী। তাঁর অনুপ্রেরণায়, অযোধ্যায় সরযূ নদীর তীরে রাম জন্মস্থলে স্থাপিত হল এক ঐতিহ্যশালী রাম মন্দিরের স্থাপত্য, যা হল ভারতীয় সভ্যতার আধুনিকতম দ্বিতীয় স্থাপত্য নিদর্শন, যা আধুনিক ভারতের এক বিরাট অবদান। তিল তিল করে ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্বের সনাতনী রামভক্তদের সাহায্যে ও সহযোগিতায় তৈরি হওয়া এই মন্দির হিন্দু বিদ্বেষী ভারতে অবস্থানরত জিহাদি সংখ্যালঘু আর তার পৃষ্ঠপোষক বামপন্থী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সেক্যুলার দল, যারা বলত রামচন্দ্র বলে কেউ কোন কালে ছিল না, রামায়ণ হল গল্প উপন্যাস বিশেষ। আবার ইউ.পি.এ সরকারের আমলে রাম মন্দিরের স্থলে মুসলমানদের সম্মানার্থে একটি মসজিদ তৈরি হোক কিংবা সেখানে ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্র তৈরি হোক এমনই প্রস্তাবনার ধোঁয়া তোলা হয়েছিল তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভারত বিদ্বেষী মীরজাফর দলগুলো এবং জিহাদী মনোভাবাপন্ন দলসমূহ। তবে এসব দুর্মূখদের প্ররোচনায় জল ঢেলে দিয়ে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে রাম জন্মস্থানের নিচে রাডার তরঙ্গে চিত্র নেওয়া এবং তার

পরে 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার' খনন কার্যে প্রমাণিত হল, ওই স্থানে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ বছর আগে থেকে সেখানে একটি মন্দির ছিল। সে স্থলে মাটির তলদেশ স্তম্ভ দেওয়া মেঝে, একটি শিব মন্দির, একটি শিলালিপিতে সংস্কৃত ভাষাতে লেখা কুড়িটি পংক্তি, যার শুরুতে 'ওঁম নমঃ শিবায়' লেখা রয়েছে এবং এখানে এক বিরাট দেব মন্দির ছিল, তাও লেখা রয়েছে। তাছাড়া খননকার্য সীতা দেবীর রসুই ঘরের নানান পাথরে তৈরি তৈজসপত্র, সুদৃশ্য কারুকার্য খচিত দ্রব্যাদির ভগ্নাবশেষে পাওয়া গেছে। এহেন প্রমাণাদির সাপেক্ষে অবশেষে নানা ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে আইনি লড়াইয়ে যাবতীয় সত্যা-সত্য তত্ত্বের ও তথ্যের ভিত্তিতে ৩০/৯/২০১০-এ এলাহাবাদ হাইকোর্টের এক ঐতিহাসিক রায়ে এবং তারই সমর্থনে, তথা উচ্চতর আদালতের সমর্থনে তথাকথিত বাবরি ধাঁচার স্থলে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য আইনি স্বীকৃতি পেল। আর সেই থেকে শুরু হল বাবরি ধাঁচার স্থলে ত্রিপলাশ্রিত শ্রীরাম লালার নবতর পর্যায়ে সু-সদৃশ্য অপূর্ব এক মন্দির নির্মাণের কাজ।

অতঃপর মন্দির নির্মাণের সমাপ্তিতে শ্রীরাম লালার প্রতিমা স্থাপন করা হল এবং গত ২২শে জানুয়ারি ২০২৪ এ বেলা ১২:২০টায় পৌষ শুক্লা দ্বাদশীর পূণ্য তিথিতে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর এতে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই দামোদরজি, রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের অধ্যক্ষ মহন্ত নৃত্যগোপাল দাস মহারাজজী, ড. মোহন রায় ভাগবতজী সরসংঘ চালক আর.এস.এস, রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথজী প্রমুখ। এই গৌরবোজ্জল মন্দির প্রতিষ্ঠার দিবসে বহু সাধুসন্ত, গুণীজন এবং লক্ষাধিক ভারতবাসী হিন্দু ভক্তজনের উপস্থিতিতে মন্দির প্রাঙ্গণ সরগরম হয়ে ওঠে এবং রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর থেকে সর্বসাধারণ হিন্দু জনগণের জন্য রাম লালার মন্দিরের দর্শন শুরু হয়ে গেছে। শুধু তাই নয় এই রামলালার জন্মস্থান ক্ষেত্র অযোধ্যার বাবরি ধাঁচার স্তলে নির্মিত মন্দিরে রামলালা প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে পূজিত হচ্ছে। আজ এই স্বাধীন ভারতবর্ষ অর্থাৎ হিন্দুস্তানকে হিন্দুরাষ্ট্রের স্থায়ী রূপ দেবার প্রথম পদক্ষেপ বলে গণ্য করা হচ্ছে, যা ১৩০ কোটি সনাতনধর্মী মানুষের জন্য একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র হবে এই ভারত যা সারা বিশ্বে সকল দেশের সেরা সে যে হিন্দুস্তান হামারা ধ্বনিত হল আকাশে বাতাসে। জয় শ্রীরাম, জয় ভারত মাতার জয়। ■

পরিষদ বার্তা

ভিএইচপি সভাপতি শ্রীঅলোক কুমারের প্রেস বিবৃতি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কবর খননকারীদের থেকে সাবধান!

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যদের লক্ষ করে কুরুচিপূর্ণ শ্লোগান দিয়ে লজ্জিত হয়েছে। এবার উস্কানির কারণ ছিল দিল্লি দাঙ্গার ঘটনায় উমর খালিদ এবং শারজিল ইমামের জামিন নামঞ্জুর হওয়া। এটি উল্লেখযোগ্য যে, সুপ্রিম কোর্ট দেখতে পেয়েছে যে রাষ্ট্রপক্ষের দাখিল করা নথিপত্রে তাদের দুজনের বিরুদ্ধেই প্রত্যক্ষ, সমর্থনকারী এবং সমসাময়িক প্রমাণ রয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ২০২০ সালে দিল্লিতে হিন্দুদের উপর পরিকল্পিত হামলার পেছনের বৃহত্তর ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত অপরাধগুলোতে তাদের 'কেন্দ্রীয় এবং গঠনমূলক ভূমিকা'ও লক্ষ করেছে। উমর এবং শারজিলের বিরুদ্ধে ভারতের ঐক্য ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ রয়েছে। এটি একটি জঘন্য অপরাধ। প্রত্যেকেরই বিচার প্রক্রিয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত, যেখানে অভিযুক্তরা তাদের দাবি করা নির্দোষ প্রমাণের সুযোগ পাবে। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, মুষ্টিমেয় কিছু লোক ধৈর্য্য না ধরে গভীর রাতে জেএনইউ ক্যাম্পাসের পরিবেশ কলুষিত করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। এটি লজ্জাজনক এবং কাপুরুযোচিত। বিশ্ববিদ্যালয় একটি এফআইআর দায়ের করেছে। এর তদন্ত হওয়া উচিত এবং দোষীদের বিচারের আওতায় আনা উচিত।

গণতন্ত্র এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করার লাইসেন্স দেয় না। কবর খোঁড়ার শ্লোগানগুলো এই ধরনের অধিকারের লঙ্ঘন, অশালীন এবং অপরাধমূলক। এই শ্লোগানগুলো দেশবাসীকে অভ্যন্তরীণ হুমকির কথা মনে করিয়ে দেয় এবং স্মরণ করিয়ে দেয় যে চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল্য। নিবেদনে—

বিনোদ বনসল
জাতীয় মুখপাত্র, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

পশ্চিমবঙ্গে হিংসা ও সন্ত্রাসহীন বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে আলোচনাচক্র ও সাংবাদিক সম্মেলন

বিশেষ সংবাদ

গত ৯ জানুয়ারি 'ফোরাম ফর ইন্টেলেকচুয়ালস্ অ্যান্ড প্রফেশনালস্ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এর উদ্যোগে কলকাতায় পার্ক স্ট্রিট-স্থিত পার্ক প্লাজায় আয়োজিত হয় একটি আলোচনাচক্র। এ বছর পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে হিংসা-সন্ত্রাস-রক্তপাতহীন, শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও সুরক্ষিত ভোটপর্ব এবং সুষ্ঠু ভোট গণনা পর্বের বিষয়টি উঠে আসে এদিনের আলোচনাচক্রে। রাজ্যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সংঘটিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ এবং সুষ্ঠুভাবে ভোটদানের বিষয়টি রূপায়ণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যক্রম ও কার্যপ্রণালির ব্যাপারে বক্তারা এদিন বক্তব্য রাখেন। এই সংগঠনেরই উদ্যোগে গত ২৭ জানুয়ারি কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত হয় 'প্রেস কনফারেন্স অন নন-ভায়োলেন্ট, ব্লাডলেস্ অ্যান্ড পিসফুল ইলেকশন-২০২৬'-শীর্ষক একটি সাংবাদিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের আহ্বায়ক সুধাময় সাহা, সহ-আহ্বায়ক চন্দন কুমার রায়; উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য টি.কে. চ্যাটার্জি, বসন্ত শেঠিয়া, গোপাল সরকার ও প্রদীপ সিংহরায়। রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়ে তাঁরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে রক্তপাতহীন, সন্ত্রাসমুক্ত, সুষ্ঠু ও সুরক্ষিত বিধানসভা নির্বাচন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে কী কী করণীয়—সেই বিষয়টি তাঁরা এ দিন উপস্থাপন করেন।

অবাধ নির্বাচন সংঘটিত করার যে উপায়গুলো তাঁরা সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন সেগুলো হল—

(১) ভোটদানের জন্য কিউআর কোড আবশ্যিক করা, যাতে ওই কোড ছাড়া ভোটকেন্দ্রের মূল কক্ষে প্রবেশ করা যাবে না বা ইভিএম মেশিন চালু হবে না। (২) প্রতিটি ভোটদাতার কাছে কিউআর কোড ভোটদানের ৭ দিন আগে পৌঁছে দেওয়া। (৩) পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে যেখানে হিংসা ছাড়া ভোটপর্ব হয় না, সেখানে অবশ্যই ভোটদানের একমাস আগে থেকে ও একমাস পরবর্তী সময় পর্যন্ত ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৫ বা ৩৫৬ ধারা জারি করে ভোটদান ও গণনাপর্ব সম্পন্ন করা, অথবা রাজ্যের সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ক্ষমতা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে রাখা, অথবা অন্য বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় নির্বাচন সম্পন্ন করা এবং সকল প্রকার হিংসা ও সন্ত্রাস রোধ করা। ভোট ঘোষণা থেকে শুরু করে ভোট গ্রহণ ও ভোটগণনার সময়কাল পর্যন্ত রাজ্য প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল বা নির্বাচন কমিশনের হাতে থাকা আবশ্যক। (৪) ভোট সম্পর্কিত হিংসার কারণে বহু মানুষ প্রাণ হারায়, বহু মানুষ স্বজনহারা হন। নির্বাচনে জয়ী শাসকদলের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের দরুণ দেশের প্রয়োজনীয় সম্পদ নষ্ট হয় এবং অন্যান্য অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এইরকম ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার, কঠোর শাস্তি প্রদান এবং প্রয়োজনে ওই ভোটকেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন বাধ্যতামূলক করতে হবে। (৫) প্রতিটি হাউসিং কমপ্লেক্স, যেখানে ৬০০ বা ততোধিক ভোটদাতার অবস্থান, সেখানে বুথ বা ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা, যাতে সেই ভোটাররা সুষ্ঠুভাবে ভোটদান করতে পারেন। (৬) রাজনৈতিক দলের এজেন্টরা যাতে কোন অবস্থাতেই ভোটদান কক্ষে অবস্থান না করে। ভোটকক্ষের মধ্যে শুধুমাত্র ভোটদাতা এবং ভোটপর্বের জন্য নির্দিষ্ট আধিকারিক উপস্থিত থাকবে, যাতে ভোটকক্ষের ভিতর কোনরকম অবাঞ্ছিত ঘটনা বা ভোটারকে প্রভাবিত করার মতো ঘটনা না ঘটতে পারে। (৭) ভোটদানের নির্দিষ্ট সময়ের আগে প্রতিটি অঞ্চলে স্থানীয় গুণ্ডা ও সন্ত্রাসীদের কারাবন্দী করা। (৮) ভোট গণনাকেন্দ্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পোস্টাল ব্যালট বাক্স ও ইভিএম মেশিনের বাক্স পরিবর্তনের ঘটনা ঘটে, কর্তব্যরত নিরাপত্তাকর্মীদের ঢিলেমির কারণে। এই ব্যাপারে যথোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ, গণনাকেন্দ্রগুলোতে যথেষ্ট সংখ্যক নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন এবং ইভিএমের বাক্সগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করা আবশ্যক। (৯) গণনা কেন্দ্রে ভোট গণনার সময়ও বিশাল কারচুপি হয়। গণনা কেন্দ্রগুলিতে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে একজন করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি আধিকারিক থাকা প্রয়োজন। তাদের নিরপেক্ষতার বিষয়টিও নির্বাচন কমিশনকে নিশ্চিত করতে হবে। (১০) গণনা কেন্দ্রে রিটার্নিং অফিসার ছাড়া উপস্থিত অন্যান্য অফিসারদের মধ্যেও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি আধিকারিকের সংখ্যা সমান হতে হবে অথবা অন্য বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় সঠিক ভোটগণনা নিশ্চিত করতে হবে। (১১) ভোট গণনাকেন্দ্রে বিরোধী দলের কাউন্টিং এজেন্টদের বিভিন্নভাবে অস্ত্র দেখিয়ে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। সেক্ষেত্রে গণনাকেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা মজবুত করে এই ধরনের ভীতি প্রদর্শন বন্ধ করতে হবে। ■

धर्म के 30 लक्षण

अरुण चूड़ीवाल

श्रीमद्‌भागवत् पुराण (जिसकी सप्ताह कथा होती है) में राजा परीक्षित के प्रश्न एवं शुकदेवजी के उत्तर हैं। अधिकांश उत्तर एक लम्बी कथा को दृष्टांत स्वरूप प्रस्तुत करते हुए दिये जाते हैं।

इसी प्रकार की एक कथा नारदजी वं भक्त प्रह्लाद के मध्य होती है। नारदजी पूर्व में महाराज युधिष्ठिर को दिये गये उत्तर का उल्लेख करते हैं।

श्रीमद्‌भागवत् के सप्तम स्कन्ध के 11 वें अध्याय में नारदजी स्वयं भगवान श्री हरि के मुख से सुने हुए धर्म के लक्षणों का वर्णन करते हैं। ग्यारहवें अध्याय के ये श्लोक 5 से 12 हैं।

युधिष्ठिर जी ने कहा—भगवन्! अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत्प्रेम और साक्षात् परम पुरुष भगवान् की प्राप्ति होती है।

नारद जी ने कहा—युधिष्ठिर! अजन्मा भगवान् ही समस्त धर्मो के मूल कारण हैं।

उन नारायण भगवान् को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातनधर्म का मैं वर्णन करता हूँ।

युधिष्ठिर! धर्म के ये तीस लक्षण शास्त्रों में कहे गये हैं—1. सत्य, 2. दया, 3. तपस्या, 4. शोच, 5. तितिक्षा, 6. उचित-अनुचित का विचार, 7. मन का संयम, 8. इन्द्रियों का संयम, 9. अहिंसा, 10. ब्रह्मचर्य, 11. त्याग, 12. स्वाध्याय, 13. सरलता, 14. सन्तोष, 15. समदर्शी महात्माओं की सेवा, 16. धीरे-धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, 17. मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उलटा ही होता है—ऐसा विचार, 18. मौन, 19. आत्मचिन्तन, 20. प्राणियों को अन्न आदि का यथायोग्य विभाजन, 21. उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्टदेव का भाव, 22. संतों के परम आश्रय भगवान् श्रीकृष्ण के नाम—गुण-लीला आदि का श्रवण, 23. कीर्तन, 24. स्मरण, 25. उनकी सेवा, 26. पूजा और 27. नमस्कार, 28. उनके प्रति दास्य, 29. सख्य और 30. आत्म-समर्पण—यह तीस प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान् प्रसन्न होते हैं।

वेददर्शी ऋषि—मुनियों ने युग-युग में प्रायः मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है वही धर्म उनके लिये इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। ■

সনাতনী হিন্দু সম্মেলন, দক্ষিণবঙ্গ

"যা তোমার শরীরকে ক্ষয় করে, বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে এবং আত্মাকে অধঃপতিত করে—তাকে বিষ জেনে দৃঢ়ভাবে পরিত্যাগ করো।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

অখিল ভারতীয় মাতৃশক্তি ও দুর্গাবাহিনীর বৈঠক

সরস্বতী পুজো, আমতা শিশুমন্দির, দক্ষিণবঙ্গ

সন্ত রবিদাস জয়ন্তী, গঙ্গাসাগর জেলা, দক্ষিণবঙ্গ

সেবাকার্য, সুন্দরবন জেলা, দক্ষিণবঙ্গ

২০২৬ আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় 'বিশ্ব হিন্দু বার্তা'-র স্টল

সৌজন্যে :

'চর অচর অর্পণ ন্যাস' (Char Achar Arpan Nyas)

Publisher : VISHVA HINDU PARISHAD, Dakshin Banga
33, Bhupen Bose Avenue, P.S.-Shyampukur, Kolkata-700004
Printed at Aditya Graphics & Printing, B/15/1/H/2, Balai Singha Lane, P.S.-Amherst Street, Kolkata-700009
E-mail : vishvahindu1964@gmail.com, vishvahinduvarta@yahoo.in